সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

সূচীপত্র

ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। মানব জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম সঠিক-সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দান করেনি। পূর্ণাংগ মানব জীবনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াতের অধীন করে দেওয়ার জন্যেই ইসলামের আগমন। তাই, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ আন্দোলন, একটি সর্বাত্মক বিপ্লব। মানব সমাজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দানই এ আন্দোলন ও বিপ্লবের প্রধান কর্মধারা। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূলকেও দা'য়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকেই আল্লাহর দীনের দাওয়াত দান করতে হয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর প্রকৃত পরিচয়ই হচ্ছে তিনি 'দা'য়ী ইলাল্লাহ'।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের নকীব মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (মৃত্যু ১৯৭৯) 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' ও 'খোতবাতে ইউরোপ' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ দা'ওয়াত ইলাল্লাহ' পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। একজন দা'য়ী ইলাল্লাহর কি কি গুণাবলী থাকতে হবে এবং দাওয়াতে দ্বীনের সঠিক কর্মপন্থাই বা কি- কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থে তার পরিপূর্ণ রূপরেখা চিত্রিত হয়েছে।

আবদুস শহীদ নাসিম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর গুণাবলী

(মুসলিম ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এণ্ড ক্যানাডার প্রতিনিধি ড. আনিস আহমদ ১৯৭৯ সালের ৮ এপ্রিল বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের চিন্তানায়ক, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) একটি ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। মূলত এটি এম, এস, এ-র বার্ষিক সম্মেলনের জন্যে শুভেচ্ছাবাণী হিসেবে রেকর্ড করা হয়, যদিও তা প্রশোত্তরের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

এম, এস, এ-র প্রতিনিধি

মাওলানা! দারুণ অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের দাওয়াত কবুল করায় এবং আমাদের বার্ষিক সম্মেলন '৭৯-এর জন্যে এ বিশেষ ইন্টারভিউ দিতে রাজী হওয়ায় আমি দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যানাডার মুসলমানদের এবং এম. এস. এ-র পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। এটা একান্তই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ যে, দক্ষিণ আমেরিকায় আপনার ও ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতৃবৃন্দের লিখনী ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাকে দ্রুত প্রসারিত করে চলেছে। আজ আমেরিকায় অগণিত লোক আপনাকে এক নযর দেখার জন্যে এবং আপনার পক্ষ থেকে কিছু উপদেশবাণী শুনার জন্যে অপেক্ষমান। তাদেরই প্রবল আগ্রহ ও দাবির প্রেক্ষিতে আমি আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ মুহতারাম মাওলানা! কুরআনে করীম রাসূল স.-কে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করে। কুরআন এবং সীরাতে পাকের আলোকে একজন দা'য়ীয়ে হকের জন্যে কোন্ সব গুণাবলীকে আপনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ?

জবাব ঃ আমেরিকা এবং ক্যানাডায় আল্লাহর যেসব বান্দাহ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌছে দেবেন। (অসুস্থতার কারণে) আমি বেশীক্ষণ কথা বলতে পারিনা।[১] তাই সংক্ষিপ্তভাবে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি ঃ

---

১. ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মাওলানার এ সাক্ষাতকারটি নেয়া হয়। এ সময় মাওলানা খুব অসুস্থ ছিলেন। –সংকলক

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (حم السجده - ٣٣)

অর্থ ঃ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো আর ঘোষণা করলো ঃ 'আমি একজন মুসলমান' (সূরা হামীমুস সাজদাহ- ৩৩)

এ আয়াতের পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে একথা মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াত মক্কার কঠিন বিরোধিতার পরিবেশে নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো সেই সংকটময় অধ্যায়, যখন রাসূলুল্লাহ্ স. এবং তাঁর অনুসারীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। সে পরিবেশে একথা বলা এবং ঘোষণা করা কোনো সহজ ব্যাপার ছিলো না যে, 'আমি একজন মুসলমান।'

এরূপ ঘোষণা দেয়া ছিলো হিংস্র পশুদের নিজের ওপর লেলিয়ে দেয়ার নামান্তর। এরূপ অবস্থা ও পরিবেশে প্রথম কথা এটা বলা হলো যে, সে ব্যক্তির কথাই সর্বোত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। অন্য কথায় একজন সত্যপথের দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্যই এটা যে তার দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে। তার সামনে কোনো প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে না কোনো দেশীয়, জাতীয়, বংশীয় কিংবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্যই তার মনের কোণে স্থান পেতে পারবে না। যে ব্যক্তি খালেছভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, কুরআন মজীদের শিক্ষা অনুযায়ী এমন আহ্বানকারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য এটাই হতে হবে যে, তিনি আল্লাহর একত্বের (তাওহীদের) প্রতি দাওয়াত দেবেন। তাকে এ ভাবে আহ্বান করতে হবে ঃ হে মানুষ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য বা উপাসনা করবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু পাওয়ার লোভ ও কামনা করবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশ সমূহের আনুগত্য করো। কেবলমাত্র তাঁর বিধানেরই অনুসরণ করো।

পৃথিবীতে মানুষ যে কাজই করে। সে একথা চিন্তা করেই করে যে, আমি কার গোলামী ও আনুগত্য করছি এবং কার নিকট আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের সমস্ত তৎপরতা ও চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে। হক পথের দাওয়াত দানকারীকে আমলে সালেহ্র সৌন্দর্যে সুশোভিত হতে হবে। তাকে নেক আমল করতে হবে। একটু চিন্তা করলে এ ফরমানটার তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে দাওয়াত

দানকারীর নিজের আমলই যদি দুরস্ত না হয়, তবে তার দাওয়াতের আর কোনো প্রভাবই থাকে না। তা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দেবেন তার নিজেকেই প্রথমে সে জিনিসের প্রতিমূর্তি হতে হবে। তার নিজের জীবনে আল্লাহর নাফরমানীর এতটুকু বিচ্যুতিও যেনো পাওয়া না যায়। তার নৈতিক চরিত্র এমন হতে হবে যেনো কোনো ব্যক্তি তাতে একটি দাগও খুঁজে না পায়। তার আশপাশের পরিবেশ, তার সমাজ, তার বন্ধু-বান্ধব, তার আপনজন ও আত্মীয় স্বজন যেনো একথা মনে করে যে, আমাদের মধ্যে এক উচ্চ ও পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তি রয়েছেন।

কুরআন পাকের সাথে সাথে সীরাত পাকেও আমরা হুবহু এ একই শিক্ষা পাই। রাসূলুল্লাহ স. এর হায়াতে তাইয়েবা সাক্ষ্য দেয়, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই সমাজ যাদের মধ্যে তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন, তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিলো না, যে তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রবক্তা এবং প্রশংসাকারী ছিলো না। যে ব্যক্তি তাঁর যত নিকটে অবস্থান করছিলো, সে ততো বেশী তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলো। যে লোকগুলো থেকে তাঁর জীবনের কোনো একটি দিকও গোপন ছিলো না, তারাই সর্বপ্রথম তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান করেন।

হযরত খাদীজা রা.

হযরত খাদীজা রা. বিগত পনরটি বছর হুজুর স.-এর দাম্পত্য জীবনের একান্ত সঙ্গী ছিলেন। তিনি কোনো কমবয়েসী মহিলা ছিলেন না। বরঞ্চ বয়েসে হুজুর স. থেকে ছিলেন অনেক বড়। হুজুর স.-এর নবুওয়াত লাভের কালে তাঁর বয়েস ছিলো পঞ্চান্ন বছর। এরূপ একজন বয়স্কা, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারীণী মহিলা যিনি বিগত পনেরটি বছর স্বামী হিসেবে আড়ালবিহীন নিকট থেকে তাঁকে দেখেছেন, স্বামীর কোনো দোষত্রুটি তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে স্ত্রী স্বামীর না-জায়েয কাজে শরীক হতে পারে বটে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার অপকর্মের প্রতি ঈমান আনতে পারে না। আকীদাগত ভাবেও তিনি কোনো অবস্থাতেই একথা মানতে পারেন না যে, ইনি নবী হতে পারেন কিংবা তাঁর নবী হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে হযরত খাদীজা রা. হুজুর স. এর প্রতি এতো অধিক বিশ্বাসী ও মুতাকিদ ছিলেন যে, তিনি যখন নবুওয়াত লাভের ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, তখন একটি মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা না করে দ্বিধাহীন চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

হযরত যায়েদ রা.

একেবারে নিকট থেকে যারা তাঁকে জানতেন, তাঁদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা.। একজন গোলাম হিসেবে হুজুর স.-এর সংসারে তাঁর আগমন ঘটে। পনের বছর বয়েসে তিনি এ ঘরে আসেন। হুজুর স.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তিকালে তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। অর্থাৎ গোটা পনেরটি বছর হুজুর স.-এর ঘরে থেকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে হুজুর স.-কে দেখার ও বুঝার সুযোগ তাঁর হয়েছে। হুজুর স. সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটা ঘটনার মাধ্যমে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ঘটনাটা হচ্ছে, ছোট বেলায় পিতা-মাতা থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ভাগ্য তাঁকে হুজুর স. পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাঁর বাপ-চাচারা যখন জানতে পারলো আমাদের সন্তান অমুক স্থানে গোলামীর জীবন যাপন করছে, তখন তারা মক্কায় এলো। এটা হচ্ছে হুজুর স.-এর নবুওয়াত লাভের আগেকার ঘটনা। তারা এসে হুজুর স.-কে বললো ঃ

'আমাদের ছেলেটাকে যদি আযাদ করে দেন, তবে এটা আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবাণী হবে।'

তিনি বললেন ঃ 'আমি ছেলেকে ডাকছি। সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায় তবে আমি তাকে আপনাদের সাথে রওয়ানা করিয়ে দেবো। আর সে যদি আমার কাছে থাকতে চায়, তবে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইবে আর আমি জোরপূর্বক তাঁকে দূরে ঠেলে দেবো।'

তাঁর এ জবাবে তারা বললো, আপনি বড়ই ইনসাফের কথা বলছেন। আপনি যায়েদকে ডেকে ব্যাপারটা জেনে নিন। তিনি যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ যখন সামনে উপস্থিত হলো, হুজুর আকরাম স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

এ লোকদের চেনো ঃ

যায়েদ বললেন ঃ 'জী-হ্যাঁ! এরা আমার আব্বা এবং চাচা।'

হুজুর স. বললেন ঃ 'এরা তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি যদি যেতে চাও আনন্দের সাথে যেতে পারো।'

তাঁর পিতা এবং চাচাও একই কথা বলল ঃ আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।

জবাবে হযরত যায়েদ বিন হারেছা বললেন ঃ 'আমি এ ব্যক্তির মধ্যে এমন সব সুন্দর গুণাবলী দেখেছি, যা দেখার পর আমি তাঁকে ছেড়ে বাপ-চাচা এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরে যেতে চাই না।'

হুজুর স.-এর সম্পর্কে এ ছিলো তাঁর খাদেমের সাক্ষ্য। একজন মনিবের প্রতি তার খাদেম কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কিন্তু এতো বেশী ভক্ত ও অনুরক্ত হতে পারে না

যে মনিবের প্রতি ঈমান আনবে। ঈমান আনার জন্যে মনিবের মধ্যে এমন উন্নত স্বভাব, সদাচার, পবিত্রতা এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটতে হবে, যা দেখে খাদেম যেনো দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয় যে, আমার মনিব সত্যিই নবী। একথাও মনে রাখতে হবে যে, হযরত যায়েদ কোনো মামুলী যোগ্যতার অধিকারী লোক ছিলেন না। মদীনায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হবার পর তাঁকে বহু যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হুজুর স.-এর চরিত্র সম্পর্কে এসাক্ষ্য এমন যোগ্য ব্যক্তিরই সাক্ষ্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.

হযরত আবু বকর রা. নবুওয়াত লাভের বিশ বছর পূর্ব থেকে একজন প্রগাঢ় বন্ধু হিসেবে হুজুর স.-কে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের বন্ধুত্ব ছিলো, তাঁদের একজন ছিলেন মুহাম্মদ স. এবং অপরজন আবুবকর রা.। একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুকে খুবই পসন্দ করে থাকেন। মনের কথা তার কাছে বললেন, কিন্তু এমন ভক্ত কখনো হতে পারে না যে, তাঁকে নবী বলে মেনে নেবেন। হযরত আবু বকর রা. কর্তৃক নির্দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান একথার প্রমাণ করে যে, কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ সময়ে তিনি হুজুর স.-কে পবিত্র চরিত্র, সুউচ্চ স্বভাব ও আচরণের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেয়েছিলেন। তবেই তো তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন, এমন উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই নবী হইতে পারেন এবং তাঁর নবী হওয়া উচিতও বটে।

হযরত আলী রা.

হযরত আলী রা.-এর নাম আমি প্রথমে এজন্যে উল্লেখ করিনি যে, তখন তাঁর বয়স ছিলো দশ বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছেন। কিন্তু দশ বছরের বালকও যে ঘরে থাকে, যার কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সেও ওয়াকিফহাল থাকে। বিশেষ করে হযরত আলীর মতো মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কম বয়সে হলেও তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর স্নেহ, সীমাহীন পবিত্র চরিত্র এবং সুউচ্চ স্বভাব ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিলেন।

আমলে সালেহ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সমূহ দ্বারা একথা পরিষ্কার হলো যে, কোনো ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, তার জীবনটাকেও হুবহু সে দাওয়াতের মাপকাঠিতে তৈরী করতে হবে, তার ব্যক্তি জীবন হতে হবে তার দাওয়াতের বাস্তব সাক্ষ্য ও প্রতিচ্ছবি। তাকে এমন পূত চরিত্র, উচ্চ স্বভাব

ও আচরণের অধিকারী হতে হবে – দাওয়াত ইলাল্লাহর আওয়াজ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলে যেনো তার কথায় লোকেরা প্রভাবিত হয় এবং তার আমল যেনো তার দাওয়াতের সাক্ষ্য বহন করে আর মানুষ যেনো একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ ব্যক্তির কথা সত্য না হয়ে পারে না। লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, কিন্তু তারা যেনো একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এ ব্যক্তি যা কিছু বলছে, আন্তরিকতার সাথেই বলছে, এ মতবাদ, এ নীতি ও দাওয়াতই তার জীবন বিধান। এ জন্যেই রাসূলে করিম স.-এর নিকটতম দুশমন আবু জেহেলও একবার বলেছিলো ঃ

"হে মুহাম্মদ স.! আমরা তো তোমাকে মিথ্যা বলছি না। আমরা তো ঐ দাওয়াতকে মিথ্যা বলছি যা তুমি নিয়ে এসেছো।" অর্থাৎ নিকৃষ্টতম দুশমনও তাঁর সত্যবাদিতার প্রবক্তা ছিলো। এটাই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা, স্বভাব ও আচরণের উচ্চতা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

এবং সে ঘোষণা করে আমি একজন মুসলমান।

একথার তাৎপর্য বুঝার জন্যে মক্কার মুয়াযযমার সেই পরিবেশকে সম্মুখে রাখতে হবে যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। নবুওয়াতের সে অধ্যায়ে কোনো ব্যক্তির এ ঘোষণা দেয়া যে 'আমি একজন মুসলমান' সহজ ও মামুলি ব্যাপার ছিলো না। বরং এটা ছিলো হিংস্র পশুদেরকে নিজের উপর হামলা করার আহ্বানের নামান্তর। বাস, এখন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারীর এ বৈশিষ্ট্য পরিস্কার হলো যে, তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীই নন, কেবলমাত্র পবিত্র আমলের অধিকারীই নন, বরং তিনি নিকৃষ্টতম শত্রুদের সম্মুখে এবং চরম বিরুদ্ধবাদী পরিবেশেও নিজের মুসলমান হবার কথা অস্বীকার করেন না, লুকিয়ে রাখেন না। নিজের মুসলমান হবার কথা স্বীকার করতে এবং তার ঘোষণা দিতে কোনো লজ্জা, সংকোচ ও ভয় ভীতির পরোয়া করেন না। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, 'হ্যাঁ, আমি মুসলমান, যার যা ইচ্ছা করুক।' অন্য কথায় দীনে হকের দাওয়াত দানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটা হতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বাহাদুর ব্যক্তি হবেন। আল্লাহর পথে ডাকা কোনো ভীরু কাপুরুষের কাজ নয়। সামান্য চোটেই যে ভেঙ্গে পড়ে, এমন ব্যক্তি কখনো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারে না। ঐ ব্যক্তি খোদার পথে মানুষকে ডাকার যোগ্যতা রাখে, যে কঠিনতম শত্রুতার পরিবেশে, বিরুদ্ধতার পরিবেশে এবং মারাত্মক বিপজ্জনক

পরিবেশেও ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে দণ্ডায়মান হবার সৎসাহস রাখে এবং পরিণামের কোনো পরোয়াই করে না। হুজুর স. স্বয়ং এরূপ বাহাদূরীর বাস্তব ও পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। মক্কার ঘোরতর পরিবেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করেছেন। সত্যের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই সব লোকদের মধ্যেই এ আন্দোলনকে জারী রেখেছিলেন, যারা ছিলো তাঁর খুনের পিয়াসী এবং যারা তাঁকে, তাঁর সাহাবীদেরকে চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি। এ ঘোরতর বিরুদ্ধতা, নির্যাতন ও মুসীবতের পরিবেশেও তিনি একাধারে তেরো বছর যাবত দাওয়াত পেশ করেছিলেন। অতঃপর মদীনায় পৌঁছার পর যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেসব ভয়াবহ লড়াইর সম্মুখীন হতে হয়, তাতেও তাঁর কদম কখনো পিছে হটেনি। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয়ের প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়ে, হুজুর স. স্বয়ং তখন যুদ্ধের ময়দানে কেবল নিজস্থানে শুধু অটলই ছিলেন না বরং সম্মুখে শত্রুদের সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তিনি যে কে সে কথাও গোপন রাখেন নি। তিনি বলছিলেন ঃ

أَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ ـ

"মিথ্যার লেশ নেই আমি নবী মহা-সত্য
জেনে রাখো আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।"

এ ঘোষণা তিনি ময়দানে জং-এর এমন পরিবেশে দিচ্ছিলেন, যখন তিনি শত্রুদের ছোবলের আওতায় অবস্থান করছিলেন এবং সাথে মাত্র ২/৩ জন সাথীই বাকী ছিলো। সে সময়ও তাঁর 'আমি নবী' এ ঘোষণা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়– দা'য়ী ইলাল্লাহকে এমনিই সাহসী ও বাহাদুর হতে হবে। যদি দাওয়াত দানকারী হিম্মৎ দৃঢ়তা ও বাহাদুরীর মতো গুণাবলীর অলংকারে ভূষিত না হয়, তবে সে এ পথে পা বাড়াবার যোগ্যতাই রাখে না। যদি পা বাড়ায়ও তবে সে তার ভীতি ও দুর্বলতার কারণে উল্টো গোটা আন্দোলনেরই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ কথাকটাই আমি আপনাদের সামনে রাখলাম। এ কথাগুলো সম্পর্কে যদি চিন্তা করা হয়, তবে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে যে, স্বয়ং এ কথাকটাই আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের একটা গোটা কর্মসূচী। এ অনুযায়ী যে কোনো স্থানে যে কোনো পরিবেশে কাজ করা সম্ভব।

২. দা'ওয়াত ইলাল্লাহ

দাওয়াতের প্রাথমিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল্লাহ্ তায়ালা আরবের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় শহর মক্কায় তাঁর এ বান্দা (মুহাম্মদ স.)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তাঁর নিজ শহর ও নিজ গোত্র কোরাইশদের মধ্যেই এ দাওয়াতী কাজের সূচনা করতে নির্দেশ দেন। এ কাজের সূচনাতেই যে সব হেদায়েতের প্রয়োজন ছিলো তা তাঁকে প্রদান করা হয় এবং সেগুলো ছিলো প্রধান তিন প্রকারের বিষয়বস্তু সমন্বিত ঃ

এক ঃ এ বিরাট গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যে নবী নিজেকে নিজে কিভাবে তৈরী করবেন এবং তিনি কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করবেন সেসব বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়।

দুই ঃ প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য এবং নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত ভুল ধারণা সমূহের প্রতিবাদ করা হয়, যেসব ভুল ধারণার কারণে তাদের জীবন যাত্রা অত্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিলো।

তিন ঃ প্রকৃত জীবন-যাপন পন্থার প্রতি আহ্বান এবং খোদায়ী হেদায়াতের যে সব মৌলিক চরিত্র-নীতির বিশ্লেষণ, যেগুলোর অনুসরণে বিশ্বমানবতার চিরন্তন কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে।

দাওয়াতের সূচনা হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ের এসব পথ নির্দেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত বাণীতে সমন্বিত ছিলো। এগুলোর ভাষা ছিলো স্বচ্ছ ঝরঝর-অত্যন্ত মিষ্টি মধুর, অতিশয় প্রভাব বিস্তারকারী এবং যাদের লক্ষ্য করে তা বলা হচ্ছিল–তাদের রুচি অনুযায়ী উন্নত সাহিত্যিক ভূষণে সজ্জিত। ফলে তা শ্রোতাদের হৃদয়-মনে তীর শলাকারমতো বিদ্ধ হতো; সুমধুর ভাব সামঞ্জস্যের কারণে লোকেরা আত্মহারা হয়ে তা উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে শুরু করতো।

সর্বোপরি তাতে স্থানীয় ভাবধারার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। যদিও আলোচনা করা হতো চিরন্তন সত্যের কিন্তু তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ্য ও উদাহরণ গৃহীত হতো নিকটস্থ পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকেই, যে সবের সাথে শ্রোতৃমণ্ডলীর ছিলো নিগূঢ় পরিচিতি। তাদেরই ইতিহাস, তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, তাদেরই দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণাধীন নিদর্শন সমূহ এবং তাদেরই আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তাতে আলোচনা হতো, যাতে করে তারা এর দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়।

দাওয়াতের এ প্রাথমিক অধ্যায় প্রায় তিন চার বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। (এর মধ্যে তিন বছর ছিলো গোপন দাওয়াতের পর্যায়)। এ অধ্যায় নবী করীমের স. দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া তিন ভাবে প্রকাশিত হয় ঃ

---

* প্রবন্ধটি 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১) কতিপয় সৎ ও সত্যপন্থী লোক এ দাওয়াত কবুল করে মুসলিম উম্মায় সংঘবদ্ধ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

২) একটা বিরাট সংখ্যক লোক মূর্খতা কিংবা স্বার্থপরতা অথবা বংশানুক্রমিক প্রচলিত প্রথার অন্ধ-প্রেমে মশগুল হয়ে তার বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হয়।

৩) কুরাইশ ও মক্কার পরিসীমা অতিক্রম করে এ নতুন দাওয়াতের আওয়ায অপেক্ষাকৃত বিশাল ক্ষেত্রে পদার্পণ করে।

এরপর থেকেই আরম্ভ হয় এ দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ অধ্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে প্রাচীন জাহেলিয়াতের এক তীব্র প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, যার জের আট ন'বছর কাল পর্যন্ত চলতে থাকে। শুধু মক্কাতে নয়, শুধু কুরাইশ গোত্রে নয়, আরবের অধিকাংশ অঞ্চলেই প্রাচীন জাহেলিয়াতের সমর্থকরা এ আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ আন্দোলনকে নিস্তেজ ও নিস্তনাবুদ করে দেবার জন্যে তারা সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে শুরু করে। মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা, অপবাদ, দোষারোপ, সন্দেহ-সংশয় ও নানাবিধ কুট প্রশ্নের তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকে। জনগণের অন্তরে বিবিধ-প্রকার প্রচারণা ও প্ররোচনা সৃষ্টি করতে থাকে। অপরিচিত লোকদেরকে নবী করীম স.-এর কথা শোনা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর চরম পাশবিক অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে। এভাবে তাঁদের উপর এতো অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালানো হয় যে, তাদের অনেক লোকই নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে দু'দুবার হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয়বার তাঁদের সকলকেই মদীনায় হিজরত করতে হয়। কিন্তু এ তীব্র বিরোধিতা ও ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। মক্কায় এমন কোনো বংশ ও পরিবার ছিলো না, যেখান থেকে অন্তত এক ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলামের অধিকাংশ দুশমনের কঠিন দুশমনীর কারণ এ ছিলো যে, তাদের নিজেদেরই ভাই, ভাতিজা, পুত্র, জামাই, কন্যা, বোন এবং ভগ্নিপতিরা ইসলামী দাওয়াত শুধু কবুলই করেনি ; বরং তারা ইসলামের আত্মোৎসর্গী, সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিজেদের কলিজার টুকরো সন্তানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলো। সর্বোপরি মজার ব্যাপার ছিলো যে, যারাই প্রাচীন জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এ নতুন আন্দোলনে যোগদান করছিলো, তারা জাহেলী সমাজেও সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক হিসাবে স্বীকৃতি ছিলো। আর এ আন্দোলনে যোগদানের ফলে তারা এত বেশী সৎ ও সত্যপন্থী এবং পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠছিলো যে, এ বিপ্লবী কাজটাই বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট করে তুললো।

এ সুদীর্ঘ ও কঠিন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম চলাকালে আল্লাহ তায়ালা সময়, সুযোগ ও প্রয়োজনমতো তাঁর নবীর প্রতি এমন সব আবেগময়ী ভাষণ নাযিল করতে থাকেন, -যেগুলোতে বর্তমান ছিলো দরিয়ার উচ্ছ্বসিত স্রোতবেগ, সয়লাবের দুর্নিবার শক্তি আর আগুনের তীক্ষ্ম তেজস্বীতা। এসব ভাষণে একদিকে ঈমানদারদেরকে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের কথা বলে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে জামায়াতী যিন্দেগীর চেতনা পয়দা করা হয় এবং তাদেরকে তাকওয়া, চারিত্রিক মাহাত্ম্য, পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সত্য দীন প্রচারের কর্মপন্থা তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়। সাফল্যের ওয়াদা ও জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারা তাদের সাহস যোগানো হয়। ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও উচ্চ সাহসিকতার সাথে আল্লাহর পথে জেহাদ ও সংগ্রাম করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ত্যাগ, কোরবানী ও আত্মোৎসর্গের এমন দুর্বার জজবা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয় যে, যাবতীয় বিপদ মুসীবত ও বিরুদ্ধতার গগণচুম্বী তরঙ্গমালার সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্যে তারা তৈরী হয়ে যায়। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদী, সত্যবিমুখ ও গাফলতের ঘুমোঘোরে নিমজ্জিত লোকদের সেসব জাতির ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়, যাদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ভালভাবে জানা ছিলো। দিনরাত যেসব ধ্বংসাবশেষ অঞ্চলের উপর দিয়ে সফর ব্যাপদেশে তারা যাতায়াত করতো সেসব নিদর্শনের উল্লেখ করে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়। আসমান ও জমিনের যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিনরাত চোখের সামনে প্রতিভাত হতো, যেগুলো তাদের যিন্দেগীতে তারা প্রতিটি মুহূর্তে অবলোকন করতো ও অনুভব করতো, সেসব প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দ্বারাই তৌহিদ ও আখিরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়। শিরক, সেচ্ছাচারিতা, পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের ভ্রান্তি মন-মগজে প্রভাব বিস্তারকারী সুস্পষ্ট দলীল ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়। অতঃপর তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা হয়। তাদের প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দেয়া হয়। যেসব জটিল সমস্যায় মন জর্জরিত ছিলো অথবা অন্যদের মনকে সংশায়িত করছিলো সেগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করা হয়। চতুর্দিক থেকে অন্ধ জাহেলিয়াতকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করা হয় যে, বুদ্ধি ও বিবেকের জগতে অবস্থানের জন্যে তার বিন্দু পরিমাণ স্থান থাকল না। এর সাথে তাদেরকে আল্লাহর গজব ও অভিশাপ, কিয়ামতের ভয়ঙ্কর রূপ এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হয়। তাদের খারাপ চরিত্র, ভ্রান্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি, জাহেলী রসম রেওয়ায, সত্য বিরোধিতা এবং মুমিনদেরকে নির্যাতনের কারণে তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়। নৈতিক চরিত্র ও সমাজব্যবস্থার যেসব বড় বড় মূলনীতি আল্লাহর মনোনীত সত্যভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তি, সেগুলো বিস্তারিত ভাবে তাদের সামনে পেশ করে দেয়া হয়।

এ অধ্যায়টি এককভাবে বিভিন্ন মনযিল দ্বারা সমন্বিত, যার প্রতিটি মনযিলেই দাওয়াতী কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত হয়ে উঠে। চেষ্টা সাধনা এবং বিরুদ্ধতাও

তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলন বিভিন মতাবলম্বী ও পরস্পর বিরোধী কর্মতৎপর অসংখ্য দল উপদলের সম্মুখীন হয়। তদনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণী সমূহের বিষয় বৈচিত্রও ব্যাপকতর হতে থাকে।

ইসলামী দাওয়াতের এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে নবী স.-কে যে বিস্তারিত পথ নির্দেশ প্রদান করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মক্কার ঘোর বিরোধিতার যুগে কোনো মহান চারিত্রিক শক্তি সম্মুখে অগ্রসর হবার পথ পরিস্কার করে এবং কোনো প্রভাবশালী প্রশিক্ষণ এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী লোকদেরকে সকল শক্তির সাথে টক্কর লাগাতে এবং সকল মুসীবত অকাতরে সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিম্নে এক একটি করে সেসব পথ নির্দেশ আমরা বর্ণনা করছি ঃ

দাওয়াত দানে হিকমত ও মাওয়েযাগত পদ্ধতি

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ –

(انحل : ١٢٥)

'হে নবী, তোমার রবের পথে লোকদেরকে ডাকো 'হেকমত' এবং মাওয়েযায়ে হাসানার মাধ্যমে।' (আন নহল ১২৫)

এখানে বলা হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত দানে দুটো পদ্ধতি খুব কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতে হবে। এক, হিকমাত। দুই, মাওয়েযায়ে হাসানা।

"দাওয়াতে হিকমাত প্রয়োগের মানে হচ্ছে– বেওকুফদের মতো বোকামীর সাথে যেনো দাওয়াত দেয়া না হয়। বরং বুদ্ধিমত্তার সাথে শ্রোতার মানসিকতা ও সামর্থ এবং তার ধারণ ক্ষমতা বুঝে উপযুক্ত স্থান, সময় ও সুযোগ অনুযায়ী কথা বলতে হবে। সব ধরনের লোকদেরকে একই ডাণ্ডা দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হবে– প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর এমন সব যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তার চিকিৎসা করতে হবে– যা তার মন-মানসিকতার গভীর থেকে সমস্ত রোগের উৎস মূল উপড়ে ফেলতে সমর্থ হবে।

'মাওয়েযায়ে হাসানা' বা উত্তম উপদেশের দুটি অর্থ রয়েছে। এক শ্রোতাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না ; বরং তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অন্যায় ও ভ্রান্তিকে শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দিলেই চলবে না ; বরং মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবে অন্যায়ের প্রতি যে ঘৃণা ও নফরত রয়েছে তাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। হেদায়াত ও আমলে সালেহ্র সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা যুক্তি ও বুদ্ধিগত প্রমাণই যথেষ্ট নয়– সাথে সাথে

এগুলোর প্রতি শ্রোতার আকর্ষণ ও মহব্বত পয়দা করে দিতে হবে। দুই সহানুভূতি, আন্তরিকতা ও একান্ত দরদের সাথে উপদেশ দান করতে হবে। শ্রোতা যেনো কখনো এমনটি মনে করতে না পারে যে, উপদেশদানকারী তাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করছে এবং নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে তার সাথে বিদ্রুপ করছে। বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেনো শ্রোতা অনুভব করতে পারে যে– তার সংশোধনের জন্য উপদেশ দানকারীর অন্তরে সত্যিই দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ আকুতি রয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষে তিনি তার কল্যাণ কামনা করছেন।"

কথা ও আলোচনার ধরন তর্ক বহছ ও জ্ঞান বুদ্ধির দাপট দেখানোর প্রয়োজন হবে না। একাজে উগ্র আলোচনা, অপবাদ দেয়া ও চোট লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে। আলোচনা বা কথা বলার উদ্দেশ্যে যেনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করা কিংবা নিজের বাচালতার ঢাকঢোল পেটানো না হয়। বরং দাওয়াতী কাজে আলোচনা ও কথা-বার্তা হতে হবে সুমধুর। দাওয়াত দানকারীর চরিত্র হতে হবে উচ্চমানের ভদ্রতা ও শালীনতাপূর্ণ। নিজের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যুক্তিপূর্ণ ও প্রাণাকর্ষিত দলিল প্রমাণ দিয়ে। কোনো অবস্থাতেই শ্রোতাদের মনে জিদ, গোস্বা ও উগ্রতা পয়দা হতে দেয়া যাবে না। অত্যন্ত সরল সোজাভাবে তাকে নিজের বক্তব্য-বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যখন অনুভূত হবে, শ্রোতা বক্রতর্কে অগ্রসর হচ্ছে তখন তখনই তার সাথে আলোচনা বন্ধ করে দিতে হবে। যেনো সে ভ্রান্ত পথে আরো অধিক অগ্রসর হতে না পারে।

সত্যপথের ডাকার জন্যে প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথা ও পরিবেশগত উত্তমপন্থা

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا - رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ط اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ وَاِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً - (بنى اسرائيل : ٥٣-٥٤)

'হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেনো সর্বোত্তম ভাবে কথা বলে। আসলে শয়তান তাদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক জানেন। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন। আর তিনি চাইলে তোমাদের আযাবও দিতে পারেন। আর হে নবী, আমরা তোমাকে লোকদের উপর উকীল বানিয়ে পাঠাইনি।' (বনী ইসরাঈল : ৫৩-৫৪)

অর্থাৎ– ঈমানদার লোকেরা কাফির মুশরিক এবং তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা ও কথা বলার সময় মিথ্যা, অতিরঞ্জিত ও দ্রুত কথা বলবে না। বিরুদ্ধবাদীরা যতই অন্যায় অপসন্দনীয় কথা বলুকনা কেনো মুসলমানদেরকে কোনো অবস্থাতেই কোনো না-হক ও অন্যায় কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবে না এবং রাগের মাথায় কোনো বাজে কথার প্রতি উত্তরে বাজে কথা বলা যাবে না। তাদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিবেশ অনুযায়ী তুলাদণ্ডে মেপে মেপে কথা বলতে হবে। তাদের প্রতিটি কথা হবে ন্যায় ও সত্য এবং তাদের মহান দাওয়াতের মর্যাদাসূচক।

আর কখনো যদি বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে তোমাদের মধ্যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে বলে অনুভব করো এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে করো– তখন তখনই বুঝে নেবে যে, এ হচ্ছে শয়তানের কাজ। সে তোমাকে উস্কিয়ে দিচ্ছে যেনো দাওয়াতে দীনের কাজটা বিনষ্ট হয়ে যায়। সে চায় তোমরাও তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মত সংস্কার সংশোধনের কাজ ত্যাগ করে সেরূপ ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যাও যেরূপ ঝগড়া ফাসাদে সে গোটা মানব জাতিকে লিপ্ত রাখতে চায়।

ঈমানদার লোকদের মুখ দিয়ে এমন দাবী কখনো বেরোতে পারবে না যে আমরা বেহেশতী আর অমুক লোক বা লোকেরা দোযখী। এ কাজের ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে। স্বয়ং নবীর কাজও দাওয়াত দান পর্যন্ত সীমিত। লোকদের ভাগ্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়নি যে, তিনি কারো জন্যে রহমতের আর কারো জন্যে আযাবের ফায়সালা করে দেবেন।

দাওয়াত দানকারীর মর্যাদা ও দায়িত্ব

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ - (الانعام : ١٠٤)

> 'দেখো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে অন্তর্দৃষ্টির আলো এসে পৌছেছে। এমন যে লোক নিজের দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে কাজ করবে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধত্ব গ্রহণ করবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নই।' (আনয়াম– ১০৪)

'আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নই' মানে আমার দায়িত্ব তো শুধু এতটুকু যে তোমাদের কাছে সে রৌশনী পেশ করে দেবো যা তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিটক থেকে এসেছে। অতঃপর চোখ খুলে দেখা না দেখা তো তোমাদের কাজ। যারা চোখ বন্ধ করে রাখবে জোর পূর্বক তাদের চোখ খুলে দেবো এবং তারা যা দেখবে না তাদেরকে তা দেখিয়ে ছাড়বো– এমন দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - (الانعام : ١٠٦-١٠٧)

'হে নবী! আপনার রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ অহীর অনুসরণ করুন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মুশরিকদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো (এরা শিরক না করার) তবে এরা শিরক করতো না। আমি আপনাকে এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি। আপনি তাদের উপর কোনো হাবিলদারও নন।' (আনয়াম ১০৬-১০৭।)

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আপনাকে দা'য়ী ও প্রচারক বানানো হয়েছে, কোতোয়াল বানানো হয়নি। তাদের পিছে লেগে থাকার কোনো প্রয়োজন আপনার নেই। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে লোকদের সামনে এ রৌশনী আপনি পেশ করে দেবেন, সাধ্যানুযায়ী সত্য প্রকাশের হক আদায় করতে কোনো ত্রুটি করবেন না। অতঃপর কেউ যদি এ সত্য কবুল করতে না চায়–তবে তা না করুক। লোকদের সত্যপন্থী বানিয়ে ছাড়ার দায়িত্ব আপনাকে অর্পন করা হয়নি। আর এমন কথা আপনার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তর্ভুক্তও নয় যে, আপনার নবুওয়াতের সীমানায় কোনো বাতিল পন্থীর অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। সুতরাং এ চিন্তায় আপনার মনকে পেরেশান করে তুলবেন না যে, অন্ধ লোকদেরকে কী করে দৃষ্টিশক্তি দেয়া যাবে যারা চোখ খুলে দেখতে চায় না– তাদেরকে কি করে দেখানো যাবে। যদি আল্লাহর ইচ্ছাই এ রকম হতো যে দুনিয়ায় কোনো বাতিল পন্থীর অস্তিত্ব থাকতে পারবে না তবে একাজ আপনার দ্বারা করানো আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিলো ? তাঁর একটা তাকভীনি (تكوينى) ইশারাই কি সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী বানাতে পারতো না ? কিন্তু শুরু থেকেই সেখানে উদ্দেশ্য এরূপ নয়। উদ্দেশ্য তো হচ্ছে মানুষকে হক ও বাতিল নির্বাচনের আযাদী দেয়া হবে। অতঃপর হকের রৌশনী তার সামনে পেশ করে তাকে পরীক্ষা করা হবে এ দুয়ের মাঝে সে কোনটা নির্বাচন করে। তাই আপনার জন্যে সঠিক কর্মপন্থা হচ্ছে যে রৌশনী আপনাকে দেখিয়ে দেয়া হলো, তার আলোকে আপনি সঠিক সোজা পথে চলতে থাকুন এবং যারা এ দাওয়াত কবুল করে নেবে তাদেরকে বুকে মিলিয়ে নিন এবং কখনো তাদের সঙ্গদান ত্যাগ করবেন না। পার্থিব দৃষ্টিতে তারা যতই নগণ্য মূল্যহীন হোক না কেনো। আর যারা এ দাওয়াত কবুল করবে না তাদের পিছে লেগে থাকবেন না। যে অশুভ পরিণতির দিকে তারা নিজেরাই যেতে চায়, যাওয়ার জন্যে চরম গোঁড়ামী অবলম্বন করে তাদেরকে সেদিকে যাবার জন্যে ছেড়ে দিন।

দীন প্রচারের সহজ পন্থা

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى - فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى (الاعلى : ٨-٩)

'আর হে নবী! আমি তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধে দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যাও। যদি উপদেশ ফলপ্রসু হয়।'

অর্থাৎ হে নবী! দীন প্রচারের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনো অসুবিধেয় ফেলতে চাইনে। বধিরদেরকে শুনানো আর অন্ধদেরকে পথ দেখানোর দায়িত্ব তোমার নয়। তোমাকে একটা সহজ পন্থা দিয়ে দিচ্ছি। তা হচ্ছে, তুমি উপদেশ দান করতে থাকো যতক্ষণ তুমি অনুভব করতে থাকবে যে, কেউ না কেউ এর দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত। বাকী থাকলো এ কথা যে, এর দ্বারা উপকৃত হতে কে প্রস্তুত আর কে প্রস্তুত নয় ? বস্তুত সাধারণ দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের জবাব প্রকাশিত হয়ে যাবে। তাই সাধারণ তাবলীগ ও প্রচার কাজ অবশ্যই জারি রাখতে হবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে খুঁজে বের করা যারা এ নসীহতের দ্বারা উপকৃত হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করবে। বস্তুত এ সমস্ত লোকেরাই তোমার আন্তরিক লক্ষ্যস্থল হবার অধিকারী, আর শুধুমাত্র এ লোকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এদের ছেড়ে ঐ সমস্ত লোকদের পিছে ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই, অভিজ্ঞতার আলোকে যাদের সম্পর্কে জানতে পারবে যে, তারা এ নসীহত কবুল করতে ইচ্ছুক নয়।

দীন প্রচারের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক কারা ?

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ - مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيْئٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - (الانعام - ٥٢)

'আর হে নবী! যারা রাতদিন তাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকতে থাকে আর তাঁর সন্তোষ অনুসন্ধানে নিরত থাকে, তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিওনা। তোমার উপর তাদের হিসাবের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই আর তাদের উপরও তোমার হিসাবের কোনো যিম্মাদারী নেই। তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তবে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।' (আনয়াম–৫২)

প্রথম দিকে যারা হুজুর স.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের বহুসংখ্যক লোক দরিদ্র ও শ্রমজীবি ছিলেন। হুজুর স.-এর প্রতি কুরাইশদের বড় বড় সরদার ও স্বচ্ছল অবস্থার লোকদের অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এ প্রশ্নটিও ছিলো যে– তাঁর

চতুরপার্শ্বে তো কেবল আমাদের কওমের দাস, মুক্তদাস ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই একত্রিত হয়েছে। তারা টিপ্পনী কেটে বলতো– এ লোকের সঙ্গী-সাথী ও মিছিলে কেমন সম্মানিত লোকেরা! বেলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব বাস্ এ লোকদেরকেই আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকে মনোনীত করার মত খুঁজে পেলেন। অতপর তারা ঈমানদারদের অসচ্ছল অবস্থা নিয়ে বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঈমান আনার পূর্বে তাদের কারো কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে তা নিয়েও তারা বিদ্রূপের ঢেউ তুলতো যে, কালকে পর্যন্ত যার চরিত্র এমন ছিলো, এমন এমন কাজ যে করেছে সেও দেখি এ মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আনয়ামেরই ৫৩ আয়াতে তাদের একথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে ঃ এরাই কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ হয়েছে ? এ আয়াতে এসব কথারই জবাব দেয়া হয়েছে। আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, যেসব লোক সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তোমার নিকট আসে–বড় বড় লোকদেরকে খাতির করতে গিয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিওনা। ইসলাম কবুল করার পূর্বে কেউ কোনো অপরাধ করে থাকলেও তার দায়-দায়িত্ব তো তোমার উপর বর্তাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘটনা

হুজুর স.-এর মজলিসে একবার মক্কার কতিপয় সরদার, সমাজপতি উপবিষ্ট ছিলো। হুজুর স. তাদের ইসলাম কবুল করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছিলেন।[১] এরি মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামক একজন অন্ধ হুজুর স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন। এ সময় ব্যাঘাত সৃষ্টি করাটা হুজুর স.-এর অপসন্দ হওয়ায় তিনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে সূরা আবাসা নাযিল হয় ঃ

عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى - (عبس ١-٢)

> 'বেজার হলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ সে অন্ধ তাঁর নিকট এসেছে।" (আবাসা ১-২)

ভাষণের সূচনাভঙ্গি দেখে বাহ্যত মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অনাগ্রহ এবং বড় বড় সরদারদের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ প্রদর্শন করায় নবী করীম স. -এর প্রতি এ সূরায় শাসন ও তিরস্কার করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গোটা সূরাটির প্রতি

---

১. এ সময়ে হুজুর স.-এর মজলিসে যেসব লোক বসা ছিল বিভিন্ন হাদীসে তাদের নাম পাওয়া যায়। এসব নামের তালিকায় ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমন উতবা, শাইবা, আবু জেহেল ও উমাইয়া বিন খালফের নামও পাওয়া যায়। এতে করে বুঝা যায়, এটা সে সময়কার ঘটনা, যখন হুজুর স.-এর সাথে এ লোকদের মেলা-মেশার সম্পর্ক বাকী ছিল এবং হুজুরের স. দরবারে তাদের যাতায়াত এবং তাঁর সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত তখনো শুরু হয়নি। –গ্রন্থকার

দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যায় যে, এ সূরায় মূলতঃ কাফের কুরাইশ সরদারের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে– যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং সত্য বিমুখতার কারণে নবী করীম স.-এর সত্য দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছিলো। আর হুজুর স.-কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেয়ার সাথে রেসালাতের দায়িত্ব পালনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি যেসব পন্থা অবলম্বন করছিলেন– তার ভ্রান্তিও বুঝিয়ে দেয়া হলো। তিনি যে একজন অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অনাগ্রহ এবং কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগ আরোপ করেছিলেন– তার কারণ এ নয় যে– তিনি এসব বড় লোককে সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং বেচারা অন্ধ ব্যক্তিকে নগণ্য ভাবছিলেন। এর কারণ এও নয় যে, মায়াযাল্লাহ তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিক বক্রতা বিদ্যমান ছিলো–যার কারণে আল্লাহ তায়ালা এখানে তাঁকে শাসন ও তিরস্কার করেছেন। না এ ব্যাপার এসব কিছুই নয় ; বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে, কোনো আদর্শের আহবায়ক বা দা'য়ী যখন তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্য তাকে যেনো সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা এ দাওয়াত কবুল করে নেয় ; যার ফলে প্রচার কাজ সহজতর হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের মধ্যেও যদি দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েও যায়– তবু মূল ব্যাপারে তেমন কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। দাওয়াতের সূচনাকালে হুজুর স. প্রায় এ রকম কর্মনীতিই গ্রহণ করেছিলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দ্বীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিলো এর মূল কারণ। বড় লোকের সম্মান প্রদর্শন এবং ছোট লোকদের ঘৃণা করা তাঁর লক্ষ্য ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামী দাওয়াতের সঠিক ও নির্ভুল পন্থা এটা নয়। বরং এ দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐসব লোকেরাই গুরুত্বের অধিকারী যারা সত্যানুসন্ধিৎসু– তারা যতই দুর্বল, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ও অক্ষমই হোক না কেনো। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে সত্যানুরাগ নেই, সমাজে তারা যতই উচ্চমর্যাদার অধিকারী হোক না কেনো– এ আন্দোলনের দৃষ্টিতে তারা একেবারেই গুরুত্বহীন। সুতরাং ইসলামের আহ্বান আপনি সকলের নিকটই পৌঁছাবেন বটে ; কিন্তু আপনার লক্ষ্য ও আগ্রহের অধিকারী হবে সেসব লোক–যাদের মধ্যে এ মহাসত্য গ্রহণের সম্মতি পাওয়া যাবে। আর যারা নিজেদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে মনে করে যে, তারা আপনার মুখাপেক্ষী নয় ; বরং আপনিই তাদের মুক্ষাপেক্ষী কেবল এসব দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদের নিকটই দাওয়াত পেশ করতে থাকা আপনার এ সুমহান দাওয়াতের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে নিতান্তই অপমানকর। তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى - أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى - وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى - كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (عبس ٣-١٢)

'হে নবী! তুমি কেমন করে জানবে! সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশদান তার জন্যে কল্যাণকর হতো। যেলোক বেপরোয়া ভাব দেখায়, তুমি তার প্রতি লক্ষ্যারোপ করছো। অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তবে তোমার উপর তার দায়িত্ব কি ? আর যেলোক তোমার নিকট দৌড়ে আসে আর সে ভয়ও করে, তুমি তো তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছো। কক্ষণও নয়। এটা তো একটা উপদেশ। যার ইচ্ছা সে এটা গ্রহণ করবে।'

এ সময় দীন প্রচারের ব্যাপারে নবী করীম স. যে মূল তত্ত্বটাকে উপেক্ষা করছিলেন ; এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ তায়ালা প্রথমে ইবনে আব্দুল্লাহ উম্মে মাকতুমের সাথে নবী করীম স.-এর কৃত আচরণের তিরস্কার করেছেন। অতঃপর সত্য দ্বীনের প্রচারকদের নিকট প্রকৃত গুরুত্ব কোন্ জিনিসের হওয়া উচিত আর কোনো জিনিসের নয়– তাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে ঃ এই তার বাহ্যিক অবস্থা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয় যে, সে সত্যানুসন্ধিৎসু, বাতিলের অনুসরণ করে খোদার রোষে নিপতিত হবার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সত্য পথের জ্ঞান লাভ করার জন্যে সে নিজেই নবীর নিকট এসে উপস্থিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে ঃ তার বাহ্যিক চাল-চলন ও আচরণই বলে দেয় যে, তার মধ্যে সত্যের প্রতি কোনো প্রকার অনুরাগ নেই। তাকে সত্য পথের পথনির্দেশ দেয়া হোক এমন প্রয়োজন থেকে সে নিজেকে অনেক উর্ধ্বে মনে করে। এ দুপ্রকার লোকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তাতে লক্ষ্যণীয় বিষয় এটা নয় যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমান আনলে দ্বীনের অনেক ফায়দা হতে পারে আর কারো ঈমান আনায় দ্বীনের উল্লেখযোগ্য ফায়দা হতে পারে না। বরং লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে কোন্ ব্যক্তি হেদায়াত কবুল করে নিজেকে শোধ্রানোর জন্যে প্রস্তুত আর কোন্ ব্যক্তি এ অমূল্য সম্পদের মর্যাদাদানে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত এবং এর মর্যাদা সম্পর্কে বিলকুল অনবহিত। প্রথম ব্যক্তি যদি অন্ধ, খঞ্জ, শক্তিহীন; নিঃস্ব-দরিদ্রও হয় এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে দীনের উৎকর্ষ লাভের ব্যাপারে বড় কোনো দায়িত্ব পালনেও যদি যোগ্য বলে বিবেচিত না হয় ; তা সত্ত্বেও সত্য প্রচারকের জন্যে সেই হবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার প্রতিই তাঁকে লক্ষ্যারোপ করতে হবে। কারণ এ দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে খোদার বান্দাদের সংশোধন। আর এ ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে

পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাকে যদি নসীহত করা হয় তবে সে নিজেকে সংশোধন ও পরিবর্তন করে নেবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ সমাজে যতোই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হোক না কেনো সত্য দীনের প্রচারককে তার পিছে পিছে দৌড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তার বাহ্য আচরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা গ্রহণে তার কোনো প্রকার ইচ্ছা ও আগ্রহ নেই। সুতরাং তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করা সময়ই নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যদি নিজেকে শোধরাতে না চায়-তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে সত্য দীন প্রচারকের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

এখানে যে অন্ধ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন- প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. হাফেয ইবনে আবদুল বার 'আল ইসতিয়ার' গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার 'আল ইসাবা' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ছিলেন হযরত খাদিজার রা. ফুফাতো ভাই। তার মা উম্মে মাকতুম এবং হযরত খাদীজার পিতা খুয়াইলিদ পরস্পর ভাই-বোন ছিলেন। হুজুর স.-এর সাথে তাঁর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক জানার পর তাকে তিনি দরিদ্র কিংবা কম মর্যাদার লোক মনে করে বিরক্তির সাথে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখে উপস্থিত বড় লোকদের প্রতি লক্ষ্যারোপ করেছেন বলে সন্দেহ করার কোনোই অবকাশ নেই। কারণ, সম্পর্কের দিক থেকে তিনি তো নবী করীম স.-এর ভাই (শ্যালক) ছিলেন। বংশীয় লোক ছিলেন তিনি। কোনো প্রকার মর্যাদাহীন লোক তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ যে কারণে নবী করীম স. তার প্রতি উক্তরূপ আচরণ গ্রহণ করেছিলেন, তা কুরআনের (اعمى) (অন্ধ ব্যক্তি) শব্দ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নবী করীম স.-এর অনাগ্রহ প্রকাশের মূল কারণ স্বরূপই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এখানে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এ মুহূর্তে হুজুর স.-এর মনোভাব এরূপ ছিলো যে, এ সময় যে লোকগুলোকে আমি ইসলামের দিকে আনবার চেষ্টা করছি, তাদের একজন লোকও যদি হেদায়াত কবুল করে তবে তা ইসলামের শক্তিশালী হয়ে উঠার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পক্ষান্তরে ইবনে উম্মে মাকতুম একজন অন্ধ ব্যক্তি। নিজ অক্ষমতার কারণে তিনি ইসলামের জন্যে ততোটা কল্যাণকর হতে পারেন না-যতোটা এ সরদারদের মধ্যে থেকে কেউ ইসলাম কবুল করলে আশা করা যায়। কাজেই এ সময়কার কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটানো তার ঠিক নয়। তিনি যা কিছু জানতে ও বুঝতে চান তা পরেও কোনো এক সময় জেনে নিতে পারেন।

দীন প্রচারের হিকমত

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ (العنكبوت ـ ٤٦)

'আর আহলে কিতাবের লোকদের সাথে উত্তম-পন্থা ছাড়া তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়োনা।' (আনকাবুত- ৪৬)

অর্থাৎ এ বিতর্ক যুক্তিসঙ্গত দলিল-প্রমাণ, সভ্য ও শালীন ভাষা এবং বুঝা ও বুঝানোর মাধ্যমে হতে হবে। যেনো যে ব্যক্তির সাথে কথা হচ্ছে তার চিন্তাধারা সংশোধিত হতে পারে। শ্রোতার দিলের দরজা খুলে তাতে হক কথা প্রবেশ করিয়ে দেয়া এবং তাকে সত্য পথে নিয়ে আসার চেষ্টাই হতে হবে দীন প্রচারকের মূল চিন্তা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যে পাহলোয়ানের মতো লড়াই করা তার চলবে না। বরং তাকে এমন একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের ন্যায় কাজ করতে হবে যিনি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকেন যেনো তার কোনো ভুলের কারণে রোগীর রোগ আরো বেড়ে না যায় এবং তিনি চেষ্টা করেন যেনো ন্যূন কষ্ট পেয়ে রোগী আরোগ্য লাভ করেন। অবস্থানুযায়ী এখানে আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কের সময় কিরূপ আচরণ করতে হবে– তার হেদায়াত দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ হেদায়াত বিশেষ ভাবে কেবল আহলে কিতাবদের ব্যাপারেই নয় ; বরং দীন প্রচারের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে এক সাধারণ হেদায়াত যা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ – (النحل – ١٢٥)

'তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমাত ও উত্তম নসীহতের সাথে, আর লোকদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়।' (আন নহল– ১২৫)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ – اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ –

(حم السجده – ٣٤)

'ভাল আর মন্দ এক নয় (বিরুদ্ধবাদীদের হামলা) সর্বোত্তম পন্থায় দফা করো। তাহলে দেখবে–জানের দুশমনও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।'

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ – نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ –

(المؤمنون – ٩٢)

'মন্দ ও অন্যায়কে সর্বোত্তম পন্থায় দফা করো (তোমাদের বিরুদ্ধে) তারা যেসব কথা রটনা করছে-তা আমরা জানি।' (আল মুমেনুন– ৯২)

দাওয়াতে হকের সঠিক কর্মপন্থা

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ - وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ -

'হে নবী, কোমল ও ক্ষমা সুন্দর নীতি অবলম্বন কর। 'মারূফ' কাজের নির্দেশ দিয়ে যাও এবং মুর্খদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। শয়তান কখনো যদি তোমাকে উস্কানী দেয়–তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তিনি সব জানেন, সব শুনেন। প্রকৃত পক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা তো এরূপ যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ খেয়াল যদি তাদের স্পর্শ করেও তারা সাথে সাথে সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। অতঃপর (তাদের সঠিক করণীয় কি) তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। বাকী থাকলো তাদের (শয়তানের) ভাই বন্ধুদের কথা। এদের তো শয়তান বক্র পথে টেনে নিয়ে যায়। এবং এদের বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোনো ক্রটিই করে না'। (আরাফ ১৯৯–২০২)

এ আয়াত সমূহে নবী করীম স. দাওয়াত ও তাবলীগ এবং হেদায়াত ও সংস্কার সংশোধনের হিকমাত সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শিক্ষা দেয়া হয়েছে ; এর উদ্দেশ্য শুধু হুজর স.-কে শিক্ষা দেয়াই নয় ; বরং যেসব লোক হুজুর স.-এর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি হয়ে দুনিয়াবাসীদের সরল সঠিক পথ দেখাতে প্রস্তুত হবে হুজুর স.-এর মাধ্যমে এমন সকল মানুষকেই এ হিকমাত শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। ক্রমানুসারে এ শিক্ষা ও মূলনীতিগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। দা'য়ীয়ে হকের জন্যে সবচাইতে জরুরী গুণাবলীর একটি হচ্ছে তাকে কোমল, বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও উদারচিত্ত সম্পন্ন হতে হবে। নিজ সহকর্মীদের বেলায় তাকে কোমল ও প্রেমময় সাধারণ মানুষের বেলায় দরদী ও সহানুভূতিশীল এবং বিরোধীদের বেলায় অতিশয় সহিষ্ণু হতে হবে। কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশেও তার মন মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের কঠিন বিরোধিতা এবং নিজ সহকর্মীদের দুর্বলতা সমূহ বরদাশত করার মতো সহিষ্ণু হতে হবে। সম্পূর্ণ অসহনীয় কথাকেও উদারচিত্তে এড়িয়ে যেতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যতোই শক্ত কথা, মিথ্যা, অপবাদ, জ্বালা যন্ত্রণা এবং নিতান্ত দুষ্কৃতিমূলক বাধা বিপত্তি আসুক না কেনো এ সবকিছুই তাকে উদার ও ক্ষমার দৃষ্টিতে হজম করতে হবে। কঠোরতা, কড়া ব্যবহার, তিক্ত কথা-বার্তা

এবং প্রতিশোধ মূলক উত্তেজনা এ মহান কাজের পক্ষে বিষের মতো কাজ করে। এতে কাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, গড়ে উঠে না। এ জিনিসটাকে নবী করীম স. এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমার রব আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, 'আমি ক্রোধ সন্তোষ উভয় অবস্থাতেই ইনসাফের কথা বলবো। যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবো। যে আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করবো। যে আমার প্রতি যুলুম করবে, আমি তাকে মাফ করে দেবো।' নিজের পক্ষ থেকে তিনি যাদেরকে দীন প্রচার করতে পাঠাতেন, তাদেরকেও তিনি এরূপ হেদায়াতই দিতেন ঃ

بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا -

মানে– 'তোমরা যেখানেই যাবে, তোমাদের আগমন যেনো লোকদের কাছে সুসংবাদের বিষয় হয়–ঘৃণা ও অসন্তোষের বিষয় নয়। তোমরা লোকদের জন্যে সহজতা বিধানকারী হবে– কাঠিন্য ও কঠোরতা বিধানকারী নয়।' আর আল্লাহ তায়ালাও নবী করীমের স. এ গুণটারই প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (ال عمران - ١٥٩)

'অর্থাৎ– এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা তুমি যদি পাষাণাত্মা ও রূঢ় ব্যবহারকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চতুস্পার্শ্ব থেকে সরে যেতো।' (আল ইমরান– ১৫৯)

২। দাওয়াতে হকের কামিয়াবী এ পন্থায় নিহিত রয়েছে যে, দাওয়াত দানকারী বড় বড় দর্শন ও সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিবর্তে লোকদের সরাসরি মারূফ' মানে-সোজা ও সুস্পষ্ট কল্যাণের শিক্ষা দেবে, যেসব কথাকে সাধারণ মানুষ ভাল কথা বলে জানে কিংবা যা ভাল কথা বলে মনে করার জন্যে-তাদের সাধারণ বুদ্ধিই (Common sence) যথেষ্ট হতে পারে। এ পন্থা গ্রহণের ফলে সত্য পথের দাওয়াত দানকারীর আবেদন সাধারণ ও সুধী সবাইকে প্রভাবিত করে। শ্রোতার কর্ণকুহ ভেদ করে দাওয়াত আপনিতেই তার মর্মে গিয়ে পৌছায়। এমন 'মারূফ' দাওয়াতের বিরুদ্ধে যারা চিৎকার ও হাঙ্গামা করে– তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা এবং এ দাওয়াতের কামীয়াবীর ক্ষেত্র তৈরী করে। কারণ সাধারণত মানুষ যতোই হিংসা বিদ্বেষে নিমজ্জিত থাকুক না কেনো– তারা যখন দেখে যে একদিকে একজন ভদ্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষ সরল সঠিক কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন– অপরদিকে অনেকগুলো লোক তার বিরোধিতায় সর্বপ্রকার নৈতিকতা ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে হীন কার্যক্রম গ্রহণ করছে– তখন আপনিতেই তারা ধীরে ধীরে সত্যবিরোধীদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে এবং

সত্যের দাওয়াত দানকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কেবল বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই মুকাবিলার ময়দানে থেকে যায়, অথবা সেসব লোকেরাই বিরোধীতা করতে থাকে, যাদের অন্তরে অতীত লোকদের অন্ধ অনুসরণ কিংবা জাহেলী হিংসা বিদ্বেষ কোনো প্রকার সত্যপথ গ্রহণের যোগ্যতা ও সামর্থ্যই বাকী রাখেনি। এটাই হচ্ছে সে হিকমাত যা অনুসরণের ফলে আরবে নবী করীম স.-এর কামিয়াবী হাসিল হয়েছিলো। এবং তার পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ইসলামের শ্রোতধারা এমনভাবে প্রবাহিত হতে থাকলো যে, কোথাও শতকরা ১০০জন, কোথাও ৮০ জন আবার কোথাও ৯০ জন অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়।

৩। দাওয়াতী কাজে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের মারুফের প্রশিক্ষণ দেয়া যতোটা জরুরী। এ ক্ষেত্রে তারা যতোই তর্ক বিবাদে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করুক না কেনো– দাওয়াত দানকারীকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেবল এমন লোকদের সম্বোধন করে কথা বলাই তার উচিত– যারা যুক্তি ও বুদ্ধির সাথে এ দাওয়াতকে বুঝার জন্যে প্রস্তুত হবে। কোনো জাহেল ব্যক্তি যদি কখনো জাহেলী আচরণ করতে শুরু করে এবং অর্থহীন তর্ক, ঝগড়া ও তিক্ত কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করে, তখন দা'য়ীয়ে হককে তার প্রতিপক্ষ সাজতে অস্বীকার করতে হবে। কারণ এ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ার লাভ কিছুই নেই। আর তাতে লোকসান হচ্ছে এই যে দাওয়াত দানকারীর যে শক্তি দীনের প্রচার, প্রসার ও সংশোধনের জন্যে ব্যয় হওয়া উচিত ছিলো– তা অর্থহীন কাজে বিনষ্ট হয়ে যায়।

৪। তিন নম্বরে যে হেদায়াত দেয়া হলো, সে প্রসঙ্গে আরো অধিক হেদায়াত হচ্ছে যে, দা'য়ীয়ে হক যখন বিরুদ্ধবাদীদের যুলুম, অত্যাচার, দুস্কৃতি ও মূর্খতা ব্যাঞ্জক প্রশ্ন ও অভিযোগের কারণে নিজের মন মেজাজ উত্তেজিত হচ্ছে বলে অনুভব করবে তখনই তাকে বুঝতে হবে– এটা শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তাকে খোদার পানাহ চাইতে হবে যেন তিনি নিজের বান্দাকে এ উত্তেজনায় সীমা লংঘন থেকে রক্ষা করেন এবং এমন বেসামাল হতে না দেন-যাতে দাওয়াতে হকের ক্ষতি সাধিত হবার মতো কোনো তৎপরতা তার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। দাওয়াতের হকের কাজ সর্বাবস্থায় ঠাণ্ডা দিলেই হওয়া সম্ভব। সে পদক্ষেপই সঠিক হওয়া সম্ভব–যা উত্তেজনায় পরাজিত হতে নয়, বরং স্থান পরিবেশ ও সময় সুযোগ অনুযায়ী খুব বুঝে শুনে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু শয়তান যে, কখনো এ কাজের প্রসার চায় না ও সহ্য করে না সব সময়ই আপন ভাই-বন্ধুদের দ্বারা দাওয়াত দানকারীর উপর হামলা চালাবার চেষ্টা করে এবং এ হামলার জবাব দেবার জন্যে তাকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, এ হামলার অবশ্যই জবাব দেয়া চাই। শয়তানের এ প্ররোচনা যা সে দাওয়াত দানকারীর অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়– অনেক সময় বড় বড় ধোকা ও ধর্মীয়

পরিভাষার আবরণে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে নিছক আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এ জন্যে শেষ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে মুত্তাকী লোকেরা তো নিজেদের অন্তরে কোনো প্রকার শয়তানী তৎপরতা ও প্রভাব এবং খারাপ চিন্তা অনুভব করতেই সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। অতঃপর তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারে এমতাবস্থায় কোন্ নীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বনে দাওয়াতে দীনের পক্ষে কল্যাণকর হবে আর এমতাবস্থায় দাওয়াত দীনের দাবীই বা কি। যারা আত্মপূজার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে এবং এ কারণে শয়তানদের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তারা কখনো শয়তানী প্ররোচনার সম্মুখে টিকে থাকতে পারে না। তারা শয়তানী প্ররোচনায় পরাজিত হয়ে ভ্রান্ত পথে চলতে শুরু করে। অতঃপর শয়তান তার ইচ্ছা মাফিক তাদেরকে সর্বত্র তাড়িয়ে বেড়ায় এবং কোথাও তাদের এ চলার গতি বন্ধ হয় না। বিরোধিদের প্রতিটি গালির মুকাবিলায় তাদের কাছেও একটা গালি এবং বিরোধিদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতির মুকাবেলায় তাদের কাছেও একটা ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতি মওজুদ থাকে।

এ আলোচনায় একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও আছে। তা হচ্ছে এই যে, তাকওয়া সম্পন্ন লোকেরা সাধারণত নিজেদের জীবন পদ্ধতিতে অমুত্তাকী লোকদের চাইতে ভিন্নতর হয়ে থাকে। যারা প্রকৃতই আল্লাহকে ভয় করেন এবং আন্তরিকভাবে অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচতে চান তাদের অবস্থা তো এরূপ হয়ে থাকে যে, তাদের চিন্তার কোণে সামান্য বদখেয়ালও যদি ছায়া ফেলে–তখনই তাদের খটকা অনুভূত হয় ও কষ্ট লাগে। যেমন কষ্ট অনুভূত হয়ে থাকে আঙ্গুলে কাঁটা বিধলে অথবা চোখে ধুলিকণা পড়লে। যেহেতু তারা এসব বদখেয়াল, অন্যায় বাসনা ও খায়েশ এবং বদনিয়তে অভ্যস্ত নয়– তাই এসব জিনিস তাদের স্বভাববিরোধী হয়ে থাকে। যেমন পায়ে কাটা ফুটলে, চোখে আবর্জনা প্রবেশ করলে কিংবা পরিচ্ছন্ন কাপড়ে ময়লার ছিটা লাগলে পরিচ্ছন্ন মানসিকতার লোকদের অসুবিধা হয়ে থাকে। এ খটকা ও অসুবিধা অনুভূত হবার সাথে সাথে তাদের চোখ খুলে যায়, মন সতর্ক হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা এ ক্ষতিকর আবর্জনা ঝেড়ে ফেলতে লেগে যায়। এরা সেসব লোকদের মতো নয়, যারা না খোদাকে ভয় করে আর না অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচতে চায় এবং শয়তানের সাথে মনের মিল রয়েছে। এদের মনে বদখেয়াল খারাপ বাসনা ও অসৎ উদ্দেশ্য ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু এসব নোংরামিতে নিমজ্জিত থেকেও তারা কোনো প্রকার অসুবিধা ও অস্বাভাবিকতা নিজেদের মধ্যে অনুভব করে না। যেমন কোনো ডেগচীতে শুয়োরের মাংস রান্না হচ্ছে– কিন্তু তাদের চিন্তাতেই আসে না যে এতে কি রান্না হচ্ছে। অথবা কোনো মেথর, যার সারাটা দেহে ময়লা লেগে লতপত হয়ে আছে, কিন্তু তার অনুভূতিই নেই যে তার দেহে কি জিনিস লেগে আছে।

তীব্র বিরুদ্ধতার পরিবেশে আল্লাহর পথে দাওয়াত

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (حم السجده - ٣٣)

"এবং সে ব্যক্তির কথার চাইতে ভাল কথা কার হবে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং বললো ঃ আমি মুসলমান ?"

পূর্বের আয়াতে ঈমানদার লোকদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, অতঃপর এ আয়াতে সে প্রকৃত দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে তারা মুসলমান হয়েছিলো। পূর্বের আয়াতে তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর বন্দেগীর পথ গ্রহণ করা ও পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর, তা থেকে বিভ্রান্ত না হওয়া এমন একটা নেক কাজ– যা মানুষকে ফেরেশতাদের বন্ধু ও জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। এখন তাদের পরবর্তী স্তরের কথা বলা হচ্ছে যার চাইতে উন্নত স্তর আর হতে পারে না। তা হচ্ছে– তোমরা নিজেরা নেক আমল করো এবং অন্যান্য লোকদের আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাও। তীব্র বিরুদ্ধতার পরিবেশ এবং যেখানে ইসলামের কথা বলা ও প্রকাশ করা নিজের উপর বিপদ ডেকে আনার শামিল সেখানেও বুক ফুলিয়ে বলো ঃ 'আমি মুসলমান।' আল্লাহ তায়ালার এ কথাটির পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্যে সে পরিবেশ পরিস্থিতিকে চোখের সামনে রাখা জরুরী, যে পরিবেশে এ কথাগুলো বলা হয়েছিলো। তখনকার পরিবেশ এইরূপ ছিলো যে, ব্যক্তিই নিজের মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করত সহসাই তার মনে হতো সে যোনো হিংস্র জন্তুদের জঙ্গলে প্রবেশ করছে, সেখানে প্রতিটি পশু তাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলবার জন্যে ছুটাছুটি করছে। তার চাইতে অগ্রসর হয়ে যে লোক ইসলাম প্রচারের জন্যে মুখ খুলতো সেতো যেনো হিংস্র পশুগুলোকে ডেকে বলতো ঃ 'এসো আমাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলো।' এ কঠিন অবস্থাতেই বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির আল্লাহকে নিজের রব হিসেবে মেনে নিয়ে সোজা পথ অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে অতি বড় মৌলিক নেক কাজ। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের নেক কাজ হচ্ছে, এ পরিবেশে ঘোষণা করে দেয়া যে, 'আমি মুসলমান' এবং ফলাফলের পরোয়া না করে আল্লাহর বান্দাদের তাঁরই দাসত্ব গ্রহণের প্রতি দাওয়াত দান করা এবং কাজ করতে গিয়ে নিজের আমলকে এতটুকু পবিত্র রাখা, যেনো ইসলাম ও ইসলামের পতাকাবাহীদের কোনো খুঁৎ বের করা সম্ভব না হয়।

উত্তম নেকী দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করা

সামনে অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (حم السجده - ٣٤)

'হে নবী ভাল আর মন্দ সমান নয়। মন্দের মুকাবিলা করো সে নেকী দিয়ে– যা অতীব উত্তম। তাহলে দেখতে পাবে– তোমার সাথে যাদের ছিলো চরম শত্রুতা তারা হয়ে গেছে তোমার পরম বন্ধু।'

এ আয়াতের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে সে পরিবেশ পরিস্থিতিকে চোখের সামনে রাখতে হবে– যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে নবী করীম স.-কে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের এ হেদায়াত দেয়া হয়েছিলো। তখন অবস্থা এরূপ ছিলো যে, দাওয়াত হকের বিরুদ্ধতা চরম হটকারিতা ও কঠিন আক্রমণাত্মক ভূমিকা দ্বারা করা হচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে নান হাতিয়ার ব্যবহার করা হচ্ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি ফৌজই তাঁর বিরুদ্ধে জনমনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করার কাজে নিরত ছিলো। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের নানা প্রকার কষ্ট, নির্যাতন ও পীড়া দেয়া হচ্ছিল। যাতে অতিষ্ট হয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময় হুজুর স.-এর প্রচার কাজ বন্ধ করে দেবার জন্যে এরূপ কর্মসূচী তৈরী করা হয় যে, গণ্ডগোল ও হট্টগোলকারীদের একটা দল সব সময় তাঁর পিছে লাগিয়ে রাখা হতো। যখনই তিনি দাওয়াতে হকের জন্যে মুখ খুলতেন তখন তারা এমন হৈ-হট্টগোল ও চীৎকার শুরু করতো যে তাঁর কথাই কেউ শুনতে পেত না বস্তুত এটা ছিলো খুবই নাজুক পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিতে বাহ্যত দীন প্রচারের সমস্ত পথই বন্ধ দেখা যাচ্ছিল। ঠিক এরূপ অবস্থায়ই বিরুদ্ধবাদীদের দাঁত চূর্ণ করার জন্যে হুজুর স.-কে এ হেদায়াত দেয়া হয়।

প্রথম কথাতেই বলা হয়েছে নেকী ও বদী তথা ভাল ও মন্দ এক নয়। মানে বাহ্যত তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা পাপ ও অন্যায়ের যতবড় তুফানই সৃষ্টি করুক না কেনো, তার মুকাবিলায় নেকী যতই দুর্বল, অসহায় অক্ষমই মনে হোক না কেনো ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদী ও অন্যায় তার নিজ সত্তার দিক থেকেই দুর্বল ও অসহায়। আর এ জন্যেই শেষ পর্যন্ত তা চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ থাকে তার স্বভাব প্রকৃত অন্যায় ও পাপকে ঘৃণা না করে পারে না। পাপ ও অন্যায়ের সঙ্গী সাথীরাই শুধু নয়, তার পতাকাবাহীরা পর্যন্ত মনে মনে একথা অনুভব করে যে, তারা মিথ্যাবাদী, যালেম ও নিজেদের স্বার্থের জন্যে অন্যায়ভাবে হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটাই অন্যদের মনে তাদের প্রতি আস্থা জন্মানোর পরিবর্তে তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে নিজেদের মর্যাদা

বিনষ্ট করে। আর তাদের দিলের উপর একটা চোর বসে যায়– যা প্রতিটি বিরুদ্ধবাদী পদক্ষেপের সময়ই তাদের সাহস ও সংকল্পকে ভিতরগত ভাবে দলন করতে থাকে। এ অন্যায় ও পাপের মুকাবিলায় যদি সে নেকী দ্বারা যা বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম বলে পরিলক্ষিত হয়-নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকে তবে শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবে। কারণ একে তো নেকীর মধ্যে এক বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে যা মানুষের দিলকে প্রভাবিত ও মোহময় করে তোলে। মানুষের নৈতিক চরিত্র যতোই খারাপ ও বিকৃত হয়ে যাক না কেনো সে নিজের অন্তরে নেকীর মর্যাদা অনুভব না করে পারে না। আর নেকী ও বদী যখন সম্মুখে সমরে লিপ্ত হয় এবং উভয়েরই আচ্ছাদিত মনিমুক্ত সর্ব সাধারণের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে তখন দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পর খুব কম লোকই এমন থাকতে পারে যারা অন্যায় ও পাপের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও নেকীর প্রতি আসক্ত ও উৎসর্গীকৃত না হবে।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, পাপের মুকাবিলা শুধুমাত্র নেকী দ্বারা নয় ; বরং এমন নেকী দ্বারা করতে হবে যা অতি উত্তম ও উচ্চ মানের। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তোমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করলে তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও। এটা হবে নেক কাজ। আর উচ্চতম মানের নেককাজ হবে, যে ব্যক্তি তোমার অসদাচরণ করবে সুযোগ পেলেই তোমরা তার ইহসান ও উপকার করবে।

এর সুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিকৃষ্টতম শত্রুও শেষ পর্যন্ত প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ এটাই মানব স্বভাব। কেউ গালি দিলে আপনি চুপ থাকুন। নিঃসন্দেহে এটা একটা নেকীর কাজ হবে। কিন্তু গালী দানকারীর মুখ এতে বন্ধ হবে না। আর তার গালাগালের জবাবে যদি আপনি তার কল্যাণ কামনা করেন তবে যতবড় নির্লজ্জ বিরুদ্ধবাদীই হোক না কেনো তাকে লজ্জিত হতেই হবে। অতঃপর আপনার বিরুদ্ধে খারাপ কথা তার জন্যে আর সহজ ব্যাপার হবে না। এক ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করে না, অথচ আপনি তার সমস্ত বাড়াবাড়ি সহ্য করে যাচ্ছেন। এতে হয়তো সে নিজের দুষ্কৃতির কাজে আরো সাহসী হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে কখনো তার কোনো ক্ষতি হতে যাচ্ছে আর আপনি সে ক্ষতি হতে তাকে রক্ষা করলেন, তবে সে আপনার পায়ের উপর পড়ে থাকতে বাধ্য। কারণ এরূপ নেকীর মুকাবিলায় কোনো প্রকার দুষ্কৃতি টিকে থাকাই সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এ নিয়মটাকেই কোনো স্থায়ী বা সাধারণ নিয়মে পরিণত করে নেয়া ঠিক নয় যে এ উচ্চস্তরের নেকী প্রত্যেক জানের দুশমনকেই প্রাণের বন্ধু বানিয়ে দেবে। দুনিয়তে এমন নিকৃষ্ট আত্মার লোকও হয়ে থাকে যে, আপনি তাদের বাড়াবাড়ির জবাবে ক্ষমা এবং তাদের দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে সদাচরণ করে যতোই পূর্ণতার মানবিকতা দেখান না কেনো তাতে তাদের দংশনের বিষ বিন্দুমাত্র কম হয় না। কিন্তু এরূপ চরম নিকৃষ্ট মানুষ এতই কম পাওয়া পায়– যতটা কম পাওয়া যায় পরম কল্যাণ-কামী মানুষ।

হকের দাওয়াতের সবরের গুরুত্ব

অতঃপর বলা হয় ঃ

وَمَا يُلَقَّٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ –
(حم السجده - ٣٥)

'এ গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে, যারা ধৈর্যধারণ করে। আর এ মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান'।

মানে এ প্রেসক্রিপশান যদিও খুবই কার্যকর ; কিন্তু এর ব্যবহার ও প্রয়োগের কোনো হাসি-তামাশা ও খেলার ব্যাপার নয়। এ জন্যে বিরাট মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মার-প্রয়োজন। দৃঢ় সংকল্প বিরাট সাহসিকতা, ধৈর্য্যশক্তি ও আত্মসংযমের। সাময়িক ভাবে কেউ হয়তো অন্যায়ের মুকাবিলায় বিরাট কোনো নেকী করেও ফেলতে পারে। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় ; কিন্তু যেখানে কোনো ব্যক্তিকে বছরের পর বছর ধরে এসব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতিকারীদের মুকাবিলায় দীনে হকের খাতিরে ক্রমাগত ভাবে লড়ে যেতে হয়– যারা যে কোনো নৈতিকসীমা লংঘন করতে কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ করে না। এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় থাকে মত্ত হয়ে, সেখানে নিরন্তর পাপের মুকাবিলায় নেকী তথা উচ্চ মানের নেকী এবং একবারের জন্যেও সংযমের বাধ ভেঙ্গে না যাওয়া কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ব্যাপার নয়। এ কাজ সে ব্যক্তিই করতে পারে, যে প্রশান্ত মনে সত্য দ্বীনের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করছে ; যে নিজের আত্মাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেকের অনুগত করে নিয়েছে যার মন মগজে নেকী ও সততা এমন গভীর শিকড় গেড়ে নিয়েছে যে বিরুদ্ধবাদীদের কোনো দুষ্কৃতি ও নোংরা আচরণই তাঁকে তাঁর এ মহান মর্যাদা থেকে নীচে নামাতে ও ধৈর্যহীন করতে কামিয়াব হতে পারে না।

আর এ যে বলা হলো ঃ 'এ মর্যাদা কেবল, তারাই লাভ করতে পারে, যারা বড় ভাগ্যবান।' এটা হচ্ছে প্রকৃতিরই নিয়ম। অতি বড় উচ্চ মর্যাদার মানুষই এসব গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়। আর যিনি এসব গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন, দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে সফলতার মনযিলে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নিকৃষ্টস্তরের লোকদের হীন আচরণ, জঘন্য ষড়যন্ত্র ও অমানুষিক কার্যকলাপ তাকে পরাস্ত করবে– এটা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয়

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۔ (حم السجده : ٣٢)

'তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্ররোচনা অনুভব করো, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।' (ঐ আয়াত– ৩৬)

শয়তান যখন দেখে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হীনতার মুকাবিলায় ভদ্র ও শালীন আচরণ এবং অন্যায় ও বদীর মুকাবিলায় ন্যায় ও নেকীর আচরণ গ্রহণ করা হচ্ছে তখন সে কঠিন দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সে চায় একবার হলেও কোনো ক্রমে সত্য পথের মুজাহিদরা, বিশেষ করে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সর্বোপরি তাদের নেতা এমন কিছু ভুল করে বসুক, যার ভিত্তিতে জনগণকে বলা যেতে পারে, দেখুন-অন্যায় এক তরফা হচ্ছে না। একপক্ষ থেকে অন্যায় কিছু খারাপ আচরণ হয়ে থাকলেও অপর পক্ষের লোকেরাও তো তেমন উচ্চমানের লোক নয়। অমুক অন্যায় কাজটি তো শেষ পর্যন্ত তারাও করে বসেছে।

সাধারণত মানুষের তো আর এতটুকু ক্ষমতা নেই যে, তারা এক পক্ষের বাড়াবাড়ি ও অপর পক্ষের জবাবী কাজের মাঝে তুলনা করে দেখবে। তারা যতক্ষণ দেখতে পাবে যে বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার হীন, নিকৃষ্ট ও অন্যায় আচরণের মুকাবিলায় এসব লোকেরা শালীনতা, ভদ্রতা, নেকী ও ন্যায়পরায়ণতার পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ সরছে না, ততক্ষণ তারা এদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকবে। কিন্তু এদের দ্বারা যদি কোনে রূপ অন্যায় আচরণ হয়ে বসে কিংবা তাদের মর্যাদার তুলনায় কোনো নীচু কাজ হয়ে যায়– তা অতিবড় কোনো বাড়াবাড়ির মুকাবিলায়ই হোক না কেনো, তখন তাদের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষই সমান হয়ে যায়। এবং বিরুদ্ধবাদীরাও একটা শক্ত কথার জবাবে হাজারো গালি দেবার বাহানা পেয়ে যায়। এ নাজুক ব্যাপারটির ভিত্তিতেই এরশাদ হয়েছে যে, 'শয়তানের ধোকা ও প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকো'। সে তোমার খুবই খায়েরখা ও দরদী বন্ধু সেজে তোমাকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করবে যে, অমুক বাড়াবাড়ি তো কিছুতেই সহ্য করা যেতে পারে না, 'অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে।' 'এ হামলার মুকাবিলায় তো লড়ে যাওয়া উচিত নতুবা তো তোমাদের কাপুরুষ বলা হবে এবং তোমাদের যাবতীয় সুনাম ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে'। এমন প্রতিটি অবস্থায় তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে অবাঞ্ছিত-উত্তেজনা ও প্ররোচনা অনুভব করবে তখনই সতর্ক হয়ে যাবে যে, নিশ্চয়ই এটা শয়তানের কাজ। সে তোমাদের ক্রোধান্ধ করে তোমাদের দ্বারা কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে চায়। সতর্ক হয়ে যাবার পর এমন ধারণা করে বসোনা যে, 'আমি আমার উত্তেজনা কন্ট্রোল করতে সক্ষম, শয়তান আমাকে দিয়ে কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে পারে না।' নিজের এরূপ বিচার ক্ষমতা এবং সংকল্প শক্তির ধারণা শয়তানের আর একটা অতি ভয়ানক ধোকা। এ সবের পরিবর্তে এ সময় তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কারণ তিনি যদি তৌফিক দেন এবং হেফাযত করেন তবেই মানুষ ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এ আয়াতের সর্বোত্তম তাফসীর হচ্ছে সে ঘটনা, যা ইমাম আহমদ র. তাঁর মুসনাদে হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন ঃ একবার নবী স.-এর উপস্থিতিতেই এক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে রা. অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকলো। হযরত আবু বকর রা. চুপচাপ তার গালাগাল শুনতে থাকলেন এবং নবী স. তা দেখে মুচকি হাসছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত সিদ্দীক রা.-এর ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। জবাবে তিনিও একটা শক্ত কথা তাকে বলে দিলেন। তাঁর মুখ থেকে সে কথাটা বের হতেই নবী করীম স. দারুন অসন্তোষ হয়ে পড়লেন যা তাঁর চেহারা মুবারকে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁর পিছু নিলেন এবং পথিমধ্যে এ ঘটনার কারণ জিজ্ঞেস করে আরয করলেন ঃ 'লোকটা আমাকে গালি দিতে থাকলে আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন , আর আমি তার জবাব দিলে আপনি অসন্তুষ্ট হলেন'। হুজুর স. বললেন, যতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে, ততক্ষণ তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলো এবং তোমার পক্ষ থেকে লোকটাকে জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি নিজেই যখন কথা বলে উঠলে, তখন ফেরেশতার স্থলে শয়তান এসে বসলো। আমি তো শয়তানের সঙ্গে বসতে পারি না।

সত্যের দাওয়াত দানকারীকে নিঃস্বার্থপর হওয়া

দাওয়াতে হকের ব্যাপারে দাওয়াত দানকারীর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া তার আন্তরিকতা ও সত্য পরায়ণতার এক সুস্পষ্ট দলীল। কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে নবী আল্লাহর দিকে ডাকার যে কাজ করছেন তাতে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ নেই ; বরং তিনি তো নিজে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণের জন্যেই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিচ্ছেন।

সূরা আনআমে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ -

'হে নবী, আপনি বলে দিন ঃ এ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্যে আমি তো তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছিনা। এ তো গোটা জগদ্বাসীর জন্যে সাধারণ উপদেশ ও নসীহত মাত্র'। (আয়াত- ৯০)

সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ - اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ -

'আর হে নবী, এ কাজের জন্যে তো আপনি তাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছেন না। এতো গোটা জগদ্বাসীর জন্যে এক সাধারণ নসীহত মাত্র।' (আয়াত- ১০৪)

বাহ্যত এ ভাষণে নবী করীম স.-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন কাফেরদের সমষ্টির প্রতিই করা হয়েছে। তাদের একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হে আল্লাহর বান্দারা এ হঠকারিতা কতইনা অন্যায়। নবী যদি নিজের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের একাজ চালু করতেন কিংবা তিনি যদি নিজের জন্যে কিছু চাইতেন তাহলে তোমাদের অবশ্যই একথা বলার সুযোগ ছিলো যে, আমরা কেনো এ মতলবী ব্যক্তির কথা মেনে নেবো ? কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তিনি একান্তই নিঃস্বার্থপর। তোমাদের এবং গোটা দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে তিনি নিঃস্বার্থভাবে একটা কথা পেশ করছেন, তার সাথে কোনো খামাখা কেউ জিদ করবে ? খোলা মনমানসিকতা নিয়ে তাঁর কথা শুনো, মনে লাগলে তা মেনে নাও আর মনে না চাইলে মেনে নিওনা।

সূরা মুমিনুনে বলা হয়েছে ঃ

اَمْ تَسْـئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ –

(ايت : ٧٢)

'হে নবী, আপনি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছেন? আপনার জন্যে আপনার রবের দানই উত্তম। আর তিনিই উত্তম রিযিক দানকারী।' (আয়াত-৭২)

অর্থাৎ ঈমানদারীর সাথে কোনো ব্যক্তি আপনার প্রতি এ অপবাদ দিতে পারবে না যে, আপনি কোনো আত্ম-স্বার্থ হাসিল করার জন্যে এ তৎপরতা চালাচ্ছেন। আপনার চমৎকার ব্যবসায় ছিলো ; অথচ এখন আপনি দারিদ্রে নিমজ্জিত। গোটা কওম আপনাকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতো, সকলেই ইযযত ও সম্মান করতো। এখন গালাগাল শুনছেন, পাথর নিক্ষেপ হচ্ছে এমনকি আপনার জীবন পর্যন্ত মারাত্মক সংকটাবর্তে নিমজ্জিত। শান্তিতে বিবি-বাচ্চাদের সাতে আনন্দময় দিনাতিপাত করছিলেন। আর এখন এমন কঠিন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আপতিত হয়েছেন যে, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার সময় নেই। সর্বোপরি এমন কথা নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার কারণে গোটা দেশ আপনার শত্রু হয়ে গেছে। কে বলবে এটা একজন স্বার্থপর মানুষের কাজ ? স্বার্থপর ব্যক্তি তো কওম ও কবিলার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে তোড়ে-জোড়ে নেতৃত্ব লাভের কোশেশ করে। আপনার মতো তারা এমন কথা নিয়ে ময়দানে নামে না, যা আপনার কওমের স্বার্থের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ; আর আপনি তো শুরু থেকেই সে জিনিসের শিকড় কেটে আসছেন যার ভিত্তিতে আরব মুশরিকদের উপর কুরাইশ কবিলার জমিদারী প্রতিষ্ঠিত।

সূরা সাবায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَاسَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ - اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ- وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ - (ايت : ٤٧)

'হে নবী, আপনি বলে দিন ; আমি যদি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চেয়েই থাকি ; তবে তা তোমাদেরই জন্যে। আমার পারিশ্রমিকের যিম্মাদার তো আল্লাহ। আর তিনি প্রতিটি ব্যাপারের সাক্ষ্য।'

প্রথম বাক্যাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি যদি সত্যিই কোনো প্রতিফল চেয়ে থাকি তবে তা তো তোমাদেরই জন্যে। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি যদি সত্যিই কোনো প্রতিফল চেয়েই থাকি, তবে তা তোমাদেরই কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাক্যের শেষাংশের তাৎপর্য হচ্ছে অভিযোগ ও অপবাদ দানকারীর যে অপবাদ ইচ্ছা দিতে থাকুক। আল্লাহই সব কিছু জানেন। আমি যে একজন নিঃস্বার্থ মানুষ, ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে একাজ করছিনে – এ ব্যাপারে আল্লাহই সাক্ষ্য।

সূরা সোয়াদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

'হে নবী আপনি বলে দিন, এ দীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না আর না আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (আয়াত– ৮৬)

মানে আমি সে সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে মিথ্যা দাবী নিয়ে উত্থিত হয় এবং তারা যা নয় তা হয়ে বসার চেষ্টা করে। নবী করীম স. এর মুখ দিয়ে একথাটা কেবল মক্কার কাফেরদের জানানোর জন্যেই বলা হয়নি ; বরং এ কাফেরদের মধ্যে অতিবাহিত তাঁর নবুওয়াত পূর্ববর্তী চল্লিশটি বছরের যিন্দেগীই এর সাক্ষ্য হিসেবে মওজুদ রয়েছে। মক্কার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও জানতো নবী করীম স. কোনো বানোয়াট লোক নন। গোটা কওমের একজন ব্যক্তিও তাঁর মুখ দিয়ে এমন কথা কখনো শুনেনি যাতে তিনি কিছু একটা হতে চান এবং নিজেকে প্রভাবশালী করবার চেষ্টা করছেন বলে সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ থাকতে পারে।

সূরা আততুর এবং সূরা ক্বলম-এ বলা হয়েছে ঃ

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ - (الطور - ٤)

'হে নবী, আপনি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে এরা জোর পূর্বক আদায় করা জরিমানার বোঝার তলায় পড়ে নিষ্পেসিত হচ্ছে?' (তুর ৪, ক্বলম ৪৬)

হুজুর স.-এর প্রতি নয় ; মূলত কাফেরদের প্রতিই প্রশ্নটি করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, রসূল স. তোমাদের কাছ থেকে যদি পারিশ্রমিক চাইতেন কিংবা ব্যক্তিগত কোনো ফায়দা হাসিল করবার জন্যে এসব তৎপরতা চালাতেন, তবে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার ব্যাপারে তোমাদের নিকট অন্তত একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতো। কিন্তু তোমরা নিজেরাই জানো যে, তিনি তাঁর এ দাওয়াতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং কেবলমাত্র তোমাদের কল্যাণের জন্যেই তিনি প্রাণপাত করছেন। তাহলে তোমরা যে শান্ত মনে তাঁর কথাও শুনতে প্রস্তুত নও, এর কি কারণ থাকতে পারে ? এ প্রশ্নটাতে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রুপও নিহিত রয়েছে। সারা দুনিয়ার কৃত্রিম ধর্মনেতা এবং ধর্মীয় আস্তানাসমূহের সেবায়েতদের মতো আরবেও মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত পুরোহিতরা প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় ব্যবসা চালাতো। এ প্রসঙ্গেই তাদের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয় যে, একদিকে এসব ধর্মীয় ব্যবসায়ীরা প্রকশ্যভাবে তোমাদের নিকট নযর-নিয়ায এবং প্রতিটি ধর্মীয় কাজ পালন করার জন্যে পারিশ্রমিক আদায় করে থাকে। অপরদিকে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে উপরন্তু নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য বরবাদ করে তোমাদেরকে অত্যন্ত যুক্তি প্রমাণ সহকারে দ্বীনের সোজা সঠিক পথ প্রদর্শন করবার চেষ্টা করছেন। এখন বল, এটা তোমাদের সুস্পষ্ট বেআকলী ছাড়া আর কি যে, তোমরা এ মহান ব্যক্তি থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছো এবং ঐসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি দৌড়ে যাচ্ছো ?

এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র আয়াত আছে যেটি নিয়ে কিছুটা তর্কের অবকাশ আছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

'হে নবী, এ লোকদের বলে দিন ঃ এখানে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রকার পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। তবে নৈকট্যের ভালবাসা অবশ্যই পেতে চাই।' (আশ্‌শূরা – ২৩)

এখানে قرب (নৈকট্য) শব্দটির সত্যিকার তাৎপর্য নিয়ে মুফাসরিদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।

একদল এর অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝেছেন। এবং আয়াতটির তাৎপর্য এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন যে, এ কাজে আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। কিন্তু এটা অবশ্যই চাই যে, 'তোমরা (কুরাইশরা) তোমাদের ও আমার মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। তোমাদের তো কর্তব্য ছিলো আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু তা যদি না-ই মানো তবে অন্তত সারা আরবের মধ্যে তোমরাই আমার দুশমনির জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করো না।' –এ হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীর যা বহু সংখ্যক রাবীর সূত্রে ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে জরীর, তাবরানী, বায়হাকী এবং ইবনে সায়াদ প্রমুখ উদ্ধৃত করেছেন। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, সুদ্দি, আবু মালেক, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহাক, আতা ইবনে দীনার এবং অন্যান্য বড় মুফাসসীরগণও এ তাফসীরই করেছেন।

দ্বিতীয় দল قرب কে قرب (নৈকট্য) ও (নিকটত্ব) অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে একাজে আমি তোমাদের কাছে এতটুকু ছাড়া আর কিছুই চাই না যে, 'তোমাদের মাঝে আল্লাহর নৈকট্যের ভাব জাগ্রত হোক' অর্থাৎ– তোমরা ঠিক হয়ে যাও। ব্যস্ এটাই আমার পুরস্কার। এ তাফসীর হযরত হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত। এর সমর্থনে কাতাদা থেকেও একটি কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। এমনকি তাবরানীর বর্ণনায় এর সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাসেরও একটা মত উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআনে মজীদেরই অন্য জায়গায় এ বিষয়টা নিম্নোক্ত ভাষায় এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا – (الفرقان – ٥٧)

> 'এ লোকদের বলে দাও এ কাজে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা। আমার পারিশ্রমিক হচ্ছে এ যে, যার ইচ্ছা সে নিজের খোদার পথ গ্রহণ করবে।' (ফোরকান – ৫৭)

তৃতীয় দল قرب শব্দের অর্থ করেছেন قرب (আত্মীয়-স্বজন)। তাদের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে– 'তোমরা আমার নিকটাত্মীয়দের ভালবাসবে – এছাড়া এ কাজের আর কোনো পুরস্কারই আমি তোমাদের কাছে চাই না।' অতঃপর এ দলের কেউ কেউ মনে করেন। নিকটাত্মীয় বলতে আবদুল মুত্তালিবের গোটা বংশধরদেরই বুঝায়। আর কেউ কেউ কেবলমাত্র হযরত আলী; ফাতেমা রা. এবং তাঁদের সন্তানদের পর্যন্ত এটাকে সীমাবদ্ধ মনে করেন, হযরত সায়ীদ ইবনে

যুবায়ের রা. ও আমর ইবনে শুয়াইব রা. থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এ তাফসীর ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী ইবনে হুসাইন (যয়নুল আবেদীন) এর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ তাফসীর কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ মক্কায় যখন সূরা আশ-শূরা নাযিল হয়, তখন হযরত আলী ও ফাতেমার বিয়েই হয়নি, সন্তান হওয়ার তো দূরের কথা। আর আবদুল মুত্তালিবের বংশধররাও সকলেই তখনো নবী স. এর সঙ্গী-সাথী হয়নি, বরং তাদের অনেকেই প্রকাশ্যভাবে দুশমনদের সঙ্গী-সাথী ছিলো। আবু লাহাবের দুশমনী তো গোটা দুনিয়া জানে। দ্বিতীয়তঃ নবী স.-এর আত্মীয় কেবল আবদুল মুত্তালিবের বংশধররাই ছিলো না। তাঁর মাতা, তাঁর পিতা ও সম্মানিতা স্ত্রীর (হযরত খাদীজা) সূত্রে কুরাইশদের সব ঘরেই তাঁর আত্মীয় এগানা ছিলো। এমনি করে কুরাইশদের সকল ঘরেই তাঁর মহোত্তম সাহাবিরা যেমন বর্তমান ছিলেন, তেমনি নিকৃষ্টতম দুশমনরাও বর্তমান ছিলো। এসব নিকৃষ্টতম লোকদের মধ্যে কেবল আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরকেই নিজের আত্মীয় বলে আখ্যা দেয়া এবং তাদের জন্যে বিশেষ ভালবাসা পাবার আবেদন জানানো নবী করীম স. এর পক্ষে কি করে সম্ভব ছিলো ? এ ব্যাপারে তৃতীয় কথাটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে একজন নবী যিনি অতি উন্নত মর্যাদায় অবস্থান করে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান করেন, সে উচ্চতম মর্যাদায় অভিষিক্ত থেকে এ মহান কাজের জন্যে পারিশ্রমিক চাওয়া যে, তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে মহব্বত করো– নিতান্তই নীচু স্তরের কাজ। কোনো সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এমনকি কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে এমন কথা শিক্ষা দেবেন আর নবী কুরাইশদের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলবেন। কুরআন মজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের যে সব কাহিনী আলোচিত হয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতির লোকদের পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক তো মহান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। (ইউনুস–৭, ২, হুদ– ২৯, ৫১, আশ্‌শূয়ারা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)। সূরা ইয়াসীনে নবীর সত্যতা যাচাইর মানদণ্ড হিসেবে বলা হয়েছে নবী তাঁর দাওয়াতী কাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন (আয়াত–২১)। স্বয়ং নবী স.-এর মুখ দিয়ে কুরআন মজিদে বার বার বলানো হয়েছে ঃ আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, এ সম্পর্কে আয়াত উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। অতঃপর এ কথা বলার কি অবকাশ আছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দানের যে কাজ আমি করছি তার বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসো। এরপর যখন আমরা দেখি এ ভাষণ ঈমানদারদের নয় বরং কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে, তখন এমন বক্তব্য আরো

অধিক অযাচিত বলে দৃষ্টিগোচর হয়। উপর থেকে গোটা ভাষণেই কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে আর সম্মুখের সম্বোধনও তাদেরই প্রতি। কথার এ প্রাসঙ্গিকতায় বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক চাওয়ার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে ? পারিশ্রমিক ঐসব লোকদের কাছেই চাওয়া যায় যাদের দৃষ্টিতে কাজটা খুবই মূল্যবান এবং যাদের জন্যে তিনি তাদের এ মূল্যবান কাজটির সুব্যবস্থা করেছেন। কাফেররা হুজুর স. এর এ মহান কাজের কি মূল্যটা দিচ্ছিল যে, তিনি তাদের বলতে পারেন ঃ আমি যে তোমাদের এ বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি এর বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসো ? বরং তারা তো উল্টা এ কাজটাকে বিরাট দোষ ও অপরাধ মনে করছিলো, যার কারণে তারা তাঁর প্রাণ পর্যন্ত নাশ করতে চেয়েছিলো।

দাওয়াতী কাজের সূচনায় পরকালীন ধারণা বিশ্বাসের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান

মক্কা মুয়াযযমায় রাসূলুল্লাহ স. যখন ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর এ কাজের ভিত্তি ছিলো ৩টি। প্রথমতঃ খোদায়ীর ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক মানা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বীয় রাসূল মনোনীত করেছেন। তৃতীয়তঃ একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, অতঃপর আর একটি পৃথিবী বানানো হবে। তখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্তকার সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং ঠিক সে দেহ ও শরীর সহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করানো হবে, যে দেহ ও শরীর নিয়ে দুনিয়াতে কাজ করছিলো। অতঃপর তাদের আকীদা বিশ্বাস ও যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব নেয়া হবে। এ হিসেব-নিকেষে যারা ঈমানদার ও সৎ প্রমাণিত হবে– তারা চিরদিনের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্যে জাহান্নামবাসী হবে।

এ তিনটি কথার প্রথম কথাটি মেনে নেয়া যদিও মক্কাবাসীদের জন্যে কঠিন ব্যাপার ছিলো, কিন্তু তথাপি তারা আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো না। আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রব, সৃষ্টিকর্তা এবং রেযেকদাতা হিসেবেও তারা মানত এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদের তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলো, সেগুলোকেও আল্লাহর সৃষ্টি বলেই তারা স্বীকার করতো। সুতরাং তাদের সাথে কেবলমাত্র বিরোধ ছিলো খোদার গুণাবলী, ক্ষমতা ইখতিয়ার ও ইলাহর মূল সত্তায় ঐসব উপাস্যদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি নেই– এ বিষয় নিয়ে।

দ্বিতীয় কথাটা মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু তাদের পক্ষে একথা স্বীকার করা অসম্ভব ছিলো যে, নবী করীম স. নবুওয়াতের দাবী করার

পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর তাদের মাঝেই জীবন যাপন করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময়ে তারা তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ, কিংবা আত্মস্বার্থরক্ষার জন্যে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে দেখতে পায়নি। তারা তো সব সময় তাঁর বুদ্ধিমত্তা ; বিচক্ষণতা, সুস্থমস্তিস্ক এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সমর্থক ও প্রশংসাকারী ছিলো। এ কারণে হাজারো টালবাহানা ও অভিযোগ রচনা সত্ত্বেও তা অন্য লোকদের বিশ্বাস করানো তো দূরের কথা স্বয়ং তাদের পক্ষেও তাদের এসব কথা সত্য বলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিলো না। কারণ, নবী করীম স. যখন সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও সত্যপন্থী তখন কেবলমাত্র রেসালাতের দাবীর ব্যাপারে মায়াযাল্লাহ্! মিথ্যাবাদী কেমন করে হতে পারেন ?

এমনি করে প্রথম দুটি কথা মক্কাবাসীদের এতো বেশী আপত্তিকর ছিলো না। যতটা আপত্তিকর ছিলো তৃতীয় কথাটি। একথাটি তাদের সম্মুখে পেশ করা হলে এটা নিয়েই তারা সর্বাধিক বিদ্রূপ করে। এ ব্যাপারটা শুনে তারা সবচাইতে বেশী বিস্ময় ও হয়রানী প্রকাশ করলো এবং তারা এটাকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে বিভিন্ন স্থানে তা ধারণার অতীত, গ্রহণ অযোগ্য বলে প্রচার করতে লাগলো। অথচ ইসলামে আনার জন্যে তাদেরকে পরকালের প্রতি বিশ্বাসী বানানো ছিলো অপরিহার্য। কারণ পরকালের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না নিলে হক ও বাতিলের নির্ভুল চিন্তা পদ্ধতি গ্রহণ, ভাল-মন্দ নির্বাচনের মেরুদণ্ড পরিবর্তন ও দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে ইসলাম প্রদর্শিত পথে চলা তাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব ছিলো। এ জন্যে মক্কা মুয়ায্যমায় অবতীর্ণ প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে পরকাল বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার জন্যে। অবশ্য সেজন্যে দলিল প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রেও এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়– যাতে লোকদেরকে মনে তৌহিদের ধারণা আপনাতেই বসে যায়। মাঝে মধ্যে রাসূলে করীম স. ও কুরআন মজীদের সত্যতা প্রমাণের যুক্তি প্রমাণও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. রাসূলুল্লাহ স.-এর গোপন দাওয়াতের তিন বছর

গোপন দাওয়াতের তিন বছর

আল্লাহ তাঁর নবীকে রিসালাতের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষ হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী তিনি নিজ কর্মতৎপরতার সূচনাতেই নবুওয়াতের ঘোষণা এবং সাধারণ দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেননি বরং যেসব সৎকর্মশীল ব্যক্তি নিছক দলিল-প্রমাণ ও বুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে তৌহিদকে গ্রহণ ও শিরককে পরিত্যাগ করতে সম্মত ছিলেন প্রাথমিক তিন বছরে তিনি গোপন পদ্ধতিতে তাদের নিকট ইসলামকে পৌঁছে দেয়ার কাজ করছিলেন। এ ছাড়া এমন কিছু বিশ্বস্ত লোকের নিকটও এ কাজের কথা প্রকাশ করা হতো, যাদের ব্যাপারে নির্ভর করা যেতো যে, তারা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে রসূলুল্লাহ স. সাধারণ ঘোষণা ও প্রকাশ্যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে শুরু করার সিদ্ধান্ত না দেন। এ কাজে হযরত আবু বকর[১] রা. এর প্রভাব সবচাইতে বেশী কার্যকর প্রমাণিত হয়।

এ কারণেই তাবারী ও ইবনে হিশাম লিখেছেন, তিনি ছিলেন খুবই মিশুকে ও প্রফুল্ল চিত্ত। সুন্দর সুকুমার গুণাবলীর কারণে তার কওমের মধ্যে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কুরাইশদের মধ্যে তাঁর চাইতে বড় বংশ-বিশারদ আর কেউ ছিলোনা। কুরাইশদের ভাল ও মন্দ লোকদের পরিচয় এবং লোকদের দোষগুণ সম্পর্কে আবু বকর রা.-এর চাইতে বেশী ওয়াকিফহাল আর কেউ ছিলো না। ব্যবসায় ছিলো তাঁর পেশা। সুন্দর পরিচ্ছন্ন লেনদেনে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান। কওমের লোকেরা তাঁর জ্ঞান, ব্যবসায় এবং উত্তম আচরণের কারণে তাঁর সাথে অধিক মেলা-মেশা ও উঠা-বসা করতো। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এ সময় তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাবান লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাঁর দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে বেশ কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর যে যে ব্যক্তিই মুসলমান হচ্ছিলেন, তারা তাদের বন্ধু মহলের সৎ লোকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এ সময় মুসলিমগণ মক্কার নির্জন আস্তানা সমূহে চুপিসারে নামায পড়তেন যেন তাঁদের ধর্ম পরিবর্তন কেউ জানতে না পারে।

---

* মাওলানা মওদুদীর সীরাতে সরওয়ারে আলম স. গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায় থেকে গৃহীত।

১। তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উসমান। কিন্তু তাঁর কুনিয়াত 'আবু বকর' এতো বেশি খ্যাতি লাভ করে যে, এর প্রভাবে আসল নাম চাপা পড়ে যায়। যমখ্শরী লিখেছেন ঃ পবিত্র স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের কারণে তাঁকে 'আবু বকর' বলা হতো। জাহেলী যুগেই তিনি এ নামে খ্যাতি লাভ করেন। – গ্রন্থকার

দ্বারে আরকামে দাওয়াতের কেন্দ্র ও ইজতেমা কায়েম

মাত্র আড়াই বছর অতীত হয়েছে। এ সময় এমন এক ঘটনা ঘটে, যাতে মক্কার কাফেরদের সাথে সময় হওয়ার পূর্বেই-সংঘর্ষ বাধার আশংকা দেখা দেয়। ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত ঃ একদিন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে কোনো একটি ঘাটিতে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলে এবং দুর্বল-কাপুরুষ বলে গালি দিতে আরম্ভ করে। কথা বাড়তে বাড়তে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এক ব্যক্তির প্রতি উটের হাড় নিক্ষেপ করলে তার মাথা ফেটে যায়। ইবনে জরীর এবং ইবনে হিশাম সংক্ষিপ্ত আকারে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফেয উমাভী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা কেটে গিয়েছিলো সে ছিলো বনী তাইমের আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর হুজুর স. অবিলম্বে সাফা পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত হযরত আরকামের বাড়ীতে মুসলমানদের ইজতিমা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র বনিয়ে নেন। মুসলমানরা এখানে একত্রিত হয়ে নামায পড়ত এবং যেসব লোক গোপনে মুসলমান হতে চায় তারাও এখানে আসতে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে এই দ্বারে আরকাম চির খ্যাতিমান। গোপন দাওয়াতের তিন বছর পরিসমাপ্তির পর প্রকাশ্যে সাধারণ দাওয়াত শুরু হবার পরও এই দ্বারে আরকামই মুসলমানদের কেন্দ্র ছিলো। এখানেই হুজুর স. আসতেন। এখানে এসেই মুসলমানরা তাঁর কাছে একত্রিত হতো এবং শেবে আবু তালিবে অন্তরীণ হওয়া পর্যন্ত এ বাড়ীই ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো।

তিন বছর গোপন দাওয়াতের খতিয়ান

প্রকাশ্য দাওয়াত সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে তিন বছরের গোপন দাওয়াতে কি পরিমাণ কাজ হলো, তার প্রতিবেদন দেখে নেয়া যাক। কুরাইশদের কোন্ কোন্ কবিলার কোন্ কোন্ ব্যক্তি মুসলমান হলেন, কুরাইশ, মাওলা[১] ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীদের মধ্যে কারা কারা ইসলাম কবুল করলেন-তাও খতিয়ে দেখা যাক। ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর সংগ্রহ করা নাম সমূহের তালিকা আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম যা আর কোথাও একত্রে লিপিবদ্ধ নেই।[২]

১। মওলা সেই ক্রীতদাসকে বলা হয় যাকে তার মালিক আযাদ করে দেয়া সত্ত্বেও সে তার সাবেক মালিকের সাথে সম্পর্ক রাখে। – গ্রন্থকার।

২। নবুওয়াত লাভের সাথে সাথে যে চারজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হুযুর স.-এর প্রতি ঈমান আনেন– তাঁদের এ তালিকার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। তারা হচ্ছেন– (১) হযরত খাদীজা রা. (২) হযরত আবু বকর রা. (৩) হযরত আলী রা. (৪) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা.। – অনুবাদক।

৩। মহিলাদের উল্লেখ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং পুত্রদের সাথে করবো। অবশ্য কোথাও তাদের বংশের সাথে তাদের কথা উল্লেখ করে দেবো। – গ্রন্থকার

বনি হাশিম ঃ (১) জাফর ইবনে আবু তালিব রা. (২) তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস খাসআমী। ইনি ছিলেন অকুরাইশ[৩] (৩) সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (হুযুর স. এর ফুফু এবং হযরত যুবায়েরের মা)। (৪) আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা. (হুযুর স. এর ফুফু এবং তুলাইব ইবনে উমাইর রা.-এর মা)।

বনি আবদুল মুত্তালিব ঃ (৫) উবাইদা ইবনে হারেস ইবনে মুত্তালিব রা.।

বনি আব্দে শামস ইবনে আব্দে মান্নাফ ঃ (৬) আবু হুযাইফা ইবনে উৎবা ইবনে রাবিআ রা. (৭) তাঁর স্ত্রী সাহ্লা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর রা.।

বনি উমাইয়া ঃ (৮) উসমান ইবনে আফ্ফান রা. (৯) তাঁর মাতা আরওয়া বিনতে কুরাইয রা. (১০) খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস্ ইবনে উমায়া রা. (তার পিতা সায়ীদের কুনিয়াত ছিলো ঃ আবু উহাইহা) (১১) তাঁর স্ত্রী উমাইমা বিনতে খাল্ফ খোজায়ীয়া রা. কেউ কেউ এর নাম উমাইনা লিখেছেন) (১২) উম্মে হাবীবা বিন্তে আবু সুফিয়ান রা. (প্রথমে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। পরে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা লাভ করেন)।

বনি উমাইয়ার মিত্র গোত্রসমূহ থেকে ঃ (১৩) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইবনে রিয়াব (১৪) আবু আহমদ ইবনে জাহাশ (১৫) উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ[১]। এরা ছিলেন বনি গণম বিন দুদানের লোক, হুযুরের ফুফু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশের ভ্রাতৃবৃন্দ।

বনি তাইম ঃ (১৬) আসমা বিনতে আবুবকর রা. (১৭) উম্মে রুমান রা. (হযরত আবু বকরের স্ত্রী এবং হযরত আয়েশা ও আবদুর রহমান ইবনে আবুবকরের মা) (১৮) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. (১৯) তাঁর মাতা সা'বা বিনতে হাজরামী রা. (২০) হারেস ইবনে খালেদ রা.।

বনি তাইমের মিত্র গোত্র থেকে ঃ (২১) সুহাইব ইবনে সিনান রুমী রা.।

বনি আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ঃ (২২) যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. (হযরত খাদীজার ভাতিজা এবং হুযুর স.-এর ফুফাতো ভাই) (২৩) খালেদ ইবনে হেযাম রা. (হাকীম ইবনে হেযামের ভাই এবং হযরত খাদীজার ভাতিজা) (২৪) আসওয়াদ ইবনে নওফেল রা. (২৫) অমর ইবনে উমাইয়া রা.।

বনি আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ঃ (২৬) ইয়াযীদ ইবনে যামআ ইবনে আসওয়াদ রা.।

১। এই ব্যক্তি স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবাকে সঙ্গে নিয়ে হাবশায় হিজরত করে এবং সেখানে গিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করে।

বনি যুহরা ঃ (২৭) আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. (২৮) তাঁর মাতা শেফা বিনতে আওফ রা. (২৯) সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. (তাঁর আসল নাম ছিলো মালেক ইবনে উহাইব) (৩০) তাঁর ভ্রাতা উমাইর ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. (৩১) তাঁর ভ্রাতা আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. (৩২) মুত্তালিব ইবনে আযহার রা. (আঃ রহমান ইবনে আওফের চাচাতো ভাই) (৩৩) তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতে আবি আওফ সাহমীয়া রা. (৩৪) তুলাইব ইবনে আযহার রা. (৩৫) আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব রা. (মায়ের দিক থেকে ইনি ইমাম যুহরীর নানা ছিলেন)।

বনি যুহরার মিত্রদের মধ্যে থেকে ঃ (৩৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. (ইনি হুযাইল গোত্রের লোক। বনি যুহরার মিত্র হিসেবে মক্কায় বসবাস করতেন) (৩৭) উৎবা ইবনে মাসউদ রা. (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাই) (৩৮) মিকদাদ ইবনে আমরুল কিন্দি রা. (আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ তাঁকে মিত্র করে রেখেছিলেন। (৩৯) খাব্বাব ইবনে ইরত রা. (৪০) শুরাহ বিল ইবনে হাসনা আল-কিন্দি রা. (৪১) জাবির ইবনে হাসনা আল কিন্দি রা. (শুরাহবিলের ভ্রাতা) (৪২) জুনাদা ইবনে হাসনা রা. (শুরাহবিলের ভাই)।

বনি আদী ঃ (৪৩) সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রা. (হযরত উমর রা. এর ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই) (৪৪) তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রা. (হযরত উমরের বোন) (৪৫) যায়েদ ইবনে খাত্তাব রা. (হযরত উমরের বড় ভাই) (৪৬) আমের ইবনে রবীয়া আল আনাযী রা. (ইনি ছিলেন বনি আদির মিত্র। খাত্তাব তাঁকে পুত্র বানিয়ে রেখেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ আনাসী ছিলো তার কুনিয়াত) (৪৭) তাঁর স্ত্রী লাইলা বিনতে আবু হাসমা রা. (৪৮) মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাদমা রা. (৪৯) নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ আন্নাহহম রা. (৫০) আদী ইবনে নাদলা রা. (৫১) উরওয়া ইবনে আবু উসাসা রা. (আমর ইবনে আসের মায়ের পক্ষের ভাই) (৫২) মাসউদ রা. ইবনে সুয়াইদ ইবনে হারেসা ইবনে নাদলা।

বনি আদীর মিত্রদের মধ্য থেকে ঃ (৫৩) ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ (একে খাত্তাব চুক্তিবদ্ধ করে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন) (৫৪) খালেদ ইবনে বুকাইর ইবনে আবদে ইয়ালিল লাইছী রা. (৫৫) ইয়াস রা. (৫৬) আমের রা. (৫৭) আকিল রা.।

বনি আবদুদ দার ঃ (৫৮) মুস্য়াব ইবনে উমায়ের রা. (৫৯) আবু রুম ইবনে উমায়ের রা. (মুসআবের ভ্রাতা) (৬০) ফিরাস ইবনে নদর রা. (৬১) জহম ইবনে কায়েস রা.।

বনি জুমাহ ঃ (৬২) উসমান ইবনে মাযউন রা. (৬৩) তাঁর ভাই কুদামা ইবনে মাযউন রা. (৬৪) তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাযউন রা. (৬৫) সায়েব ইবনে উসমান ইবনে মাযউন রা. (৬৬) মা'মার ইবনে হারেস ইবনে মা'মার রা. (৬৭) তাঁর ভাই হাতেব ইবনে হারেস রা. (৬৮) তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে মুজালৃলাল আমেরী রা. (৬৯) মা'মারের ভাই খাত্তাব ইবনে হারেস রা. (৭০) তাঁর স্ত্রী ফুকাইহা বিনতে ইয়াসার রা. (৭১) সুফিয়ান ইবনে মা'মার রা. (৭২) নুবাইহ ইবনে উসমান রা.

বনি সাহাম ঃ (৭৩) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. (৭৪) খুনাইস ইবনে হুযাফা রা. হযরত উমরের জামাই (উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা.-র প্রথম স্বামী) (৭৫) হিশাম ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল রা. (৭৬) হারেস ইবনে কায়েস রা. (৭৭) তাঁর পুত্র বশীর ইবনে হারেস রা. (৭৮) তাঁর অপর পুত্র মা'মার ইবনে হারেস রা. (৭৯) কায়েস ইবনে হুযাফা রা. (আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার ভাই) (৮০) আবু কায়েস ইবনে হারেস রা. (৮১) আবদুল্লাহ ইবনে হারেস রা. (৮২) সায়েব ইবনে হারেস রা. (৮৩) হাজ্জাজ ইবনে হারেস রা. (৮৪) বেশর ইবনে হারেস রা. (৮৫) সা'ঈদ ইবনে হারেস রা.।

বনি সাহমের মিত্রদের মধ্য থেকে ঃ (৮৬) উমায়ের ইবনে রিযাব রা. (৮৭) মাহমিয়া ইবনে জাযউ রা. (ইনি ছিলেন হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফদলের মায়ের পক্ষের ভাই)।

বনি মাখজুম ঃ (৮৮) আবু সালমা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ রা. (হুজুর স. এর ফুফাতো ভাই এবং দুধ ভাই। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমার প্রথম স্বামী) (৮৯) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রা.। (ইনি এবং তাঁর স্বামী আবু সালমা আবু জেহেলের নিকটাত্মীয় ছিলেন) (৯০) আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রা. (এর দ্বারে আরকামের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) (৯১) আইয়াস ইবনে আবু রাবিয়া রা. (আবু জেহেলের মায়ের পক্ষের ভাই ও হযরত খালেদ ইবনে অলীদের চাচাতো ভাই) (৯২) তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামা তামিমী রা. (৯৩) অলীদ ইবনে অলীদ ইবনে মুগীরা রা. (৯৪) হিশাম ইবনে আবু হুজাইফা রা. (৯৫) সালামা ইবনে হিশাম রা. (৯৬) হাশেম ইবনে আবু হুজাইফা রা. (৯৭) হাববার ইবনে সুফিয়ান রা. (৯৮) তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান রা.।

বনি মাখযুমের মিত্রদের মধ্য থেকে ঃ (৯৯) ইয়াসির রা. (আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পিতা) (১০০) আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. (১০১) তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির রা.।

বনি আমের ইবনে লুওয়াই ঃ (১০২) আবু সাবরা ইবনে রুহম রা. (হুজুর সঃ এর ফুফু বাররাহ বিনতে আবুল মুত্তালিবের পুত্র) (১০৩) তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে সুহাইল ইবনে আমর রা. (আবু জান্দালের ভগ্নি) (১০৪) আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর রা. (১০৫) হাতেম ইবনে আমর রা. (সুহাইল ইবনে আমরের ভাই) (১০৬) সালিম ইবনে আমর রা. সুহাইল ইবনে আমরের ভাই)। ইসাবা গ্রন্থে তাঁকে সুহাইল ইবনে আমরের ভাতিজা বলা হয়েছে) (১০৭) সাকরান ইবনে আমর রা. (সুহাইল ইবনে আমরের ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা বিনতে যাময়ার প্রথম স্বামী) (১০৮) তাঁর স্ত্রী সওদা বিনতে যাময়া রা. (সুকরানের মৃত্যুর পর তিনি উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ করেন) (১০৯) সালিত ইবনে আমরের স্ত্রী ইয়াকাযা বিনতে আলকামা (ইসাবা গ্রন্থে উম্মে ইয়াকাযা লেখা হয়েছে এবং ইবনে সাআদ তার নাম ফাতেমা বিনতে আলকামা বলেছেন) (১১০) মালিক ইবনে যাময়া রা. (হযরত সওদার ভাই) (১১১) ইবনে উম্মে মাকতুম রা.।

বনি ফিহর ইবনে মালিক ঃ (১১২) আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা. (১১৩) সুহাইল ইবনে বাইদা রা. (১১৪) সা'ঈদ ইবনে কায়েস রা. (১১৫) আমর ইবনে হারেস ইবনে যুহাইর রা. (১১৬) উসমান ইবনে আবদে গানাম ইবনে যুহাইর রা. (হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের ফুফাতো ভাই) (১১৭) হারেস ইবনে সা'ঈদ রা.।

বনি আবদে কুসাই ঃ (১১৮) তুলাইব উমাইর রা. (হুজুর স. এর ফুফু আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র)।

এ পর্যন্ত উল্লেখিত ব্যক্তিরা সবাই কোরাইশের বড় বড় খান্দানের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক মাওলা, দাস ও দাসী গোপন দাওয়াতের তিন বছরে ইসলাম কবুল করেন। তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ (১১৯) উম্মে আয়মান বারকা বিনতে সালাবা (ইনি শৈশব থেকে হুজুর স.-কে কোলে করে লালন পালন করেন।) (১২০) যিন্নিরা, রুমীয়া, (আমর ইবনে মুয়াম্মিল এর মুক্ত দাসী) (১২১) বিলাল ইবনে রাবাহ রা., (ইনি উমাইয়া ইবনে খালফের দাস ছিলেন) (১২২) তাঁর মাতা হামামা রা. (১২৩) আবু ফুকাইয়া ইয়াসার জাহমী রা. সুফওয়ান ইবনে উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। (১২৪) লবিবা-মুয়াম্মিল ইবনে হাবীবের দাসী। (১২৫) উম্মে উবাইস রা. বনি তাইম ইবনে মুররাহ অথবা বনি যুহরার দাসী। (প্রথম মত যুবাইর ইবনে বাককারের এবং দ্বিতীয় মত বালাজুরীর) (১২৬) আমের ইবনে ফুহাইরা রা. (তোফায়েল ইবনে আবদুল্লাহর গোলাম)। (১২৭) সুমাইয়া রা. (হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের মাতা এবং আবু হুযাইফা ইবনে মুগীরা মাখযুমীর দাসী)।

এ ছাড়া অকুরাইশদের মধ্যে যারা মক্কার এই প্রাথমিক অধ্যায়ে ইসলাম কবুল করেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১২৮) মেহজান রা. ইবনে আদরা আসলামী।

(১২৯) মাসউদ রা. ইবনে রবীয়া ইবনে আমর। ইনি ছিলেন বনি উলুহুন ইবনে খুযাইমার কাররাহ কবিলার লোক।

এভাবে প্রথম চারজন মুসলমানদের সাথে এ ১২৯ জন মিলিত হওয়ায় তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৩। সাধারণ দাওয়াত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এরা হুজুর স.-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলিম জামায়াতে শরীক হয়েছিলেন।[১]

এরা ছিলেন স্থির স্বভাব, প্রশান্তি চিত্ত ও বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী। এরা কেবল যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমেই শিরকের অনিষ্টতা বুঝতে পেরছিলেন। এরা মেনে নিয়েছিলেন তৌহিদের তাৎপর্য ও সত্যতা। মুহাম্মদ স.-কে স্বীকৃতি দান করেছিলেন, কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে নিজেদের হেদায়েতের একমাত্র পথ এবং আখেরাতের যিন্দেগীকে অবশ্যম্ভাবী মহাসত্য বলে বুঝে নিয়েছিলেন। এই মুখলিস ও দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী বাহিনী তৈরী করে নেয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে হুজুর স. প্রকাশ্যভাবে ইসলামী দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করেন।

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য্য দান কর। আমাদের অবিচলিত রাখ এবং এ কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান কর।" (বাকারা- ২৫০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন কর। বাতিলপন্থিদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (আলে-ইমরান- ২০০)

১। আল ইসতিয়াব গ্রন্থে ইবনে আবদুল বার এবং উসদুলগাবা গ্রন্থে ইবনে আসীর লিখেছেন ঃ "বলা হয়ে থাকে হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফদল প্রথম মহিলা, যিনি হযরত খাদীজার পরে মুসলমান হন।" এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে এই প্রাথমিক অধ্যায়ের মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৪। এ মহিলার আসল নাম হচ্ছে লুবাবা বিনতে হারেস। ইনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনার বোন, হযরত খালেদ ইবনে অলীদের খালা এবং হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের মায়ের পক্ষের বোন ছিলেন। তার প্রসঙ্গে "বলা হয়ে থাকে" তার মতে দুর্বল বাক্য ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা তালিকায় তার নাম উল্লেখ করিনি। —গ্রন্থকার